সম্পাদকীয়

সিয়াম সাধনার প্রাপ্তি রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত চিরপ্রবহমান থাকুক

পবিত্র মাস রমযান রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের তিনটি অধ্যায় সম্বলিত এক মহান মাস। এই পবিত্র মাস ইবাদত বন্দেগী ও দান খয়রাতের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিয়ে আমরা এর শেষ লগ্নে উপনীত হতে যাচ্ছি। পরম করুণাময় স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের এই সিয়াম সাধনাকে কবুল করে আমাদের নাজাত দিন। রমযানে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে এটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

রমযানে ইবাদত ও ত্যাগের যে স্বাদ আমরা লাভ করেছি, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও জামা'তী জীবনে আনন্দ করার যে সৌভাগ্য দান করেছেন তা আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী হোক।

প্রসঙ্গক্রমে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ইবাদতে ও কুরবানীকে গ্রহণ করে বিগত এক বছরে যে অশেষ অনুকম্পা ও কল্যাণ দান করেছেন তার এক ঝলক উদ্ধৃত করছি।

১৯৫ টি দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দু'টি নতুন দেশ SERBIA ও LITHUANIA–য় জামা'ত বিস্তার লাভ করেছে।

মসজিদের সংখ্যা বেড়েছে ৩৯৯ টি আর প্রচার কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৬টি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তত্ত্বাবধানে ৬৯ টি ভাষায় পবিত্র কুরআন করীমের সম্পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন করে ছাপা হয়ে গিয়েছে। 'রূহানী খাযায়েন' এর প্রথম ১২ খণ্ডের Computerized সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ইংরেজী ভাষায় অনুদিত **'তাযকেরা'** পুণর্নিরীক্ষণ করে পুণর্মূদ্রণ করা হয়েছে। আহমদীয়াত তথা ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য তুলে ধরতে ৪০ টি দেশ থেকে কয়েকটি ভাষায় ৫২৩ টি বিভিন্ন পুস্তক আর ৩১ টি ভাষায় ২৪ লাখ ৮৬ হাজার Pamphlet-Folder ছেপে প্রকাশ করা হয়েছে।

কুরআন মজীদ থেকে নির্ধারিত কিছু আয়াত, বাছাইকৃত কিছু হাদীস আর চয়নকৃত কতিপয় উদ্ধৃতির অনুবাদও বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

একই ভাবে বিভিন্ন ভাষায় সেগুলোর CD তৈরীর কাজও এগিয়ে চলছে। বিশ্বব্যাপী MTA -এর অসাধারণ প্রভাব, MTA-এর কল্যাণে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের বয়আত গ্রহণ, বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে রুইয়া, কাশ্‌ফ ও স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা পথ-নির্দেশ করে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছেন।

নুসরত জাহাঁ স্কীমের আওতায় ১২ টি দেশের ৩৬ টি হাসপাতালে মানবসেবায় উৎসর্গকারী ৩৮ জন চিকিৎসক অতুলনীয় সেবা দান করে চলছেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯

সূচীপত্র *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** ২
- **হাদীস শরীফ** ৩
- **অমৃত বাণী** ৪
- ***ঈদুল ফিতরের খুতবা ঃ*** ৫-১১
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** ১২-২১
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **নেযামে নও** ২২-২৫
  ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্
- **যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়** ২৬
  আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
- **নাজাতের দশক ও ইতেকাফ** ২৭
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করার কল্যাণ** **২৮-২৯**
  কোহিনুর বেগম
- **হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর বাংলাদেশ সফর**
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল **৩০-৩৩**
- **সংবাদ** ৩৪-৩৫
- **দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে** ৩৬
  সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ এম, আহমদ

প্রচ্ছদ ডিজাইন : **তারেক আহমদ (সবুজ)**

এ বছর ৪ লাখ ১৬ হাজার ১০ জন ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ৯৮ টি দেশে ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

জামা'তের সাথে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ এই অনুগ্রহপূর্ণ সম্পর্ক আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকার দাবী রাখে। কাজেই আমরা যেন তাঁর আদেশের অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর তবেই রমযানের ইবাদত স্বার্থক হবে।

রমযানের পর আগত ঈদের আনন্দের সাথে বঞ্চিত-অসহায় ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে শামিল করে নিতে আমরা যেন অবশ্যই তৎপর থাকি। ঈদের আনন্দ সর্বপ্রকার গ্লানি ও কালিমা মোচন করে অনাবিল আনন্দে ভরে তুলুক সবার জীবন। সকলের জন্য রইল ঈদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

ঈদ মুবারক

কুরআন শরীফ

সূরা হুদ-১১

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ
اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿٦٢﴾

৬২। আর সামূদ (জাতির) প্রতি[১৩২৬] তাদের ভাই সালেহ্‌কে (পাঠিয়েছিলাম)। সে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি মাটি থেকে তোমাদের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং এতে তোমাদের আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তার কাছে ক্ষমা চাইতে থাক এবং তওবা করে তাঁর দিকে বিনত হও। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি নিকটে (এবং তিনি দোয়া) কবুলকারী'।

১৩২৬। 'সামুদ' শব্দটি আরবী হওয়াতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এই জাতি আরব বংশোদ্ভুত এবং আরব উপজাতি। এটা এক অসার যুক্তি যে, সালেহ্ কোন বিদেশী নামের অনুবাদ। কারণ কুরআন করীম সকল বিদেশী নামসমূহ অনুবাদ না করে অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করেছে, যেমন মূসা (moses), হারূন (Aaron), ইউনুস (Jonah) এবং যাকারিয়া (Zachariah) 'সামুদ' ছিল 'আদ' জাতির উত্তরাধিকারী (৭:৭৫) সুতরাং আদ এবং আরবীয়দের মধ্যেই একজাতি। আবার 'আদ' জাতিও নূহের (আ.) জাতির উত্তরাধিকারী। এটাতেই প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আ.)ও একজন আরব ছিলেন। অবশ্য নূহ (আ.) এর আবির্ভাব হয়েছিল মেসোপটেমিয়াতে এবং এই অঞ্চল পুরাকালে আরবদের দ্বারা শাসিত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের উপস্থাপনানুযায়ী 'সামুদ' জাতির অবস্থান খৃষ্টিয় যুগের কিছু পূর্বের কোন এক সময় ছিল। তাদের মতে হিজ্‌র বা আগ্‌রা এই জাতির বাসস্থান। তারা এদের 'সামুদেন' নামে অবিহিত করত, এবং হিজর এর নিকটবর্তী একটি স্থানের উল্লেখ করে যাকে আরবের লোকেরা 'ফাজ আন্-নাকাহ্' বলে থাকে। টলেমি (Ptolemy-১৪০ খৃষ্টপূর্ব) বলেন : হিজ্‌র-এর নিকটে 'বাদানাতা' নামে এক স্থান আছে।' ফুতুহুশ শামের' প্রণেতা আবু ইসমাঈল বলেন সামুদ জাতি বোস্‌রা (সিরিয়া) এবং এডেন-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল এবং তথায় তারা শাসন করত। সম্ভবত তারা উত্তর দিকে দেশান্তরিত হয়েছিল। আল্-হিজ্‌র (যা মাদইনে সালেহ্ নামেও পরিচিত), বোধ হয় এই জাতির রাজধানী ছিল যা মদীনা এবং তাবুকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই হিজ্‌র সেই উপত্যকার অন্তর্গত যাকে 'ওয়াদি কুরা' বলা হয়। এটা প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, কুরআন করীমের বহু স্থানে হুদ এবং সালেহ্ নবী (আ.)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং প্রত্যেক স্থানে একই নিয়মের ক্রম পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়, যেমন হুদ (আ.)-এর ঘটনাবলী প্রথমে এবং সালেহ্ (আ.)-এর কথা পরে বর্ণিত হয়েছে, যা প্রকৃতই কালানুক্রমিক বিন্যাস। এতে এই কথাই প্রমাণিত হয়, কুরআন করীম নির্ভুলভাবে ও সঠিক ক্রমবিন্যস্ত ঐতিহাসিক ধারায় ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাবলী তুলে ধরেছে, যা কালের বিস্মৃতির তলে হারিয়ে গিয়েছিল এবং প্রচ্ছন্নতার মধ্যে আচ্ছাদিত ছিল। কোন কোন লেখকের মতে 'সামুদ' হল 'আদ ও সানী-য়া' অর্থাৎ দ্বিতীয় 'আদের' আর একটি নাম মাত্র। অন্যান্যদের মতে দ্বিতীয় 'আদ'এর পরে তাদের আবির্ভাব। সামুদ পহাড়ে প্রান্তরে রাজত্ব করত (৭:৭৫) এবং সেই দেশ প্রচুর ঝর্ণা ও স্রোতস্বিনীময় ও বাগবাগিচাপূর্ণ ছিল। সেখানে অতি চমৎকার ও উত্তম জাতীয় খর্জুর বৃক্ষ উৎপন্ন হত। তারা জমিতে কৃষি কার্য করে শষ্যাদি উৎপাদন করত (২৬:১৪৮–১৪৯)। কুরআন করীমের এই বর্ণনা সমর্থিত হয় প্রত্নতাত্ত্বিক প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণলিপি দ্বারা। এগুলির পাঠোদ্ধার করেছিল মুসলমান আমীর মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে। মনে হয় সালেহ নবীর যুগের পর এই জাতির পতন আরম্ভ হয়, কারণ তাঁর সময়ের মাত্র কয়েক শতাব্দী ব্যবধানেই বিজয়ী জাতিগুলোর মধ্যে তাদের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আরব দেশ কোন এক এসিরিয়ান বাদশাহ্ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল (৭২২-৭০৫ খৃ: পূর্ব) এবং পরাজিত উপজাতিগুলোর ফিরিস্তির মধ্যে সামুদ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় খুদিত এক শিলালিপিতে–এটা সেই রাজা তাঁর বিজয়ের গৌরবময় স্মৃতি রক্ষার্থে খোদাই করেছিল গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ডাইভোরস (৮০ খৃ:পূ:) , প্লিনী (৭৯খৃ: পূ:) এবং টলেমী তাদের রচিত পুস্তক সামুদ জাতির সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ান (JUSTINIAN) যখন আরব দেশে আক্রমণ করেছিল তখন তার সৈন্যবাহিনীতে তিনশত সামুদী সৈন্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই উপজাতির চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব্য)।

হাদীস শরীফ

তাহজ্জুদ নামাযের ফযিলত

* হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত রসূল করীম (সা.)কে বলতে শুনেছেন, “হে লোক সকল! শান্তির দ্বারা সম্ভাষণ বৃদ্ধি কর, আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় কর এবং যখন অন্যরা নিদ্রা যায় তখন নামায পড়, তাহলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে” (তিরিমিযী)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, “রোযার জন্য রমযানের পর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাস হলো মহররম এবং নির্ধারিত (ফরয) নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হলো গভীর রাতের নামায (তাহাজ্জুদ নামায)” [মুসলিম]।

হযরত রসূল করীম (সা.) রমযান মাসে এবং অন্য সময়েও তাহাজ্জুদ নামায এগার রাকাতের বেশি পড়তেন না। আট রাকাত আদায়ের শেষে তিন রাকাত বিতের পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির ওপর দয়া প্রদর্শন করবেন, যে গভীর রাতে নফল নামাযের (তাহাজ্জুদ) জন্য উঠে এবং একই কাজের জন্য তার স্ত্রীকেও জাগায়। যদি স্ত্রী গড়িমসি করে তবে তাকে জাগাবার জন্য তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়, এবং আল্লাহ্ সেই স্ত্রীলোকের ওপর দয়া প্রদর্শন করবেন যে গভীর রাতের নফল নামাযের জন্য জাগে এবং তার স্বামীকেও একই করণের জন্য জাগায় এবং স্বামী যদি গড়িমসি করে তবে তাকে জাগানোর জন্য মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়” (আবুদাউদ)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) রমযান মাসে এবং অন্য সময়েও তাহাজ্জুদ নামায এগার রাকাতের বেশি পড়তেন না। আট রাকাত আদায়ের শেষে তিন রাকাত বিতের পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, “হে আব্দুল্লাহ্! তুমি সে লোকের মত হয়ো না, যে রাতে উঠে নামায আদায় করত, কিন্তু (এখন) তা পরিত্যাগ করেছে” (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ নিশী রাতে জেগে নামায, দোয়া ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির কাজ করলে রিপু ও কুপ্রবৃত্তিসমূহ দমন হয় এবং নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকরীভাবে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দাগণের সকলেরই এই একই অভিজ্ঞতা যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিশীথ রাতে দোয়া ও নামাযের মত এত কার্যকরী পন্থা আর কোনটি নাই। গভীর রাতের নীরব-নিভৃত ক্রন্দনে এক অব্যক্ত প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। সেই নিস্তব্ধ নীরবতায় মানুষ একাকী তার শ্রষ্টার মঙ্গল লাভ করার মহা সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তার আত্মা ঐশী আলোকে আলোকিত ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সেই আলো সে অপরের কাছে বিতরণেরও সুযোগ পায়।

মহান খোদা তাআলা আমাদেরকে এই পবিত্র মাহে রমযানের বাকী দিনগুলোতে বেশি বেশি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)
হযরত নবী করীম (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি

আমাদের পয়গাম্বরে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্রকরণ (আধ্যাত্মিক) শক্তি এত উচ্চ পর্যায়ে উপনীত ছিল যে, সমগ্র নবীকূল (আলইহেস সালাম) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে যেন কেউই তাঁর মোকাবেলায় কিছুই কাজ করে দেখাতে পারেন না। রসূল করীম (সা.) এর প্রস্তুতকৃত জামা'তের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখ যায়, তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ খোদা তাআলার জন্য উৎসর্গীত এবং নিজেদের পুণ্য ও কর্মময় জীবনে ছিলেন নজীরবিহীন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় এবং সাফল্যমণ্ডিত জীবনের এই চিত্র উদ্ভাসিত হয় যে, তিনি যে কাজের জন্য দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করার পর তিনি ইহজগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। যেমন, সরকারী বন্দোবস্ত বিভাগে কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে যাবতীয় কাগজপত্র তৈরী করে দিয়ে সর্বশেষ রিপোর্ট করেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করেন। তেমনি ভাবে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনে দেখা যায়, যেদিন **'কুম ফা আনযের'** (উঠ এবং সকলকে সতর্ক কর) প্রত্যাদেশ বাণী এসেছিল, সেই দিন থেকে **'ইয়া জায়া নাসরুল্লাহি'** এবং **'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম'** আয়াত অবতীর্ণ হওয়া কালীন সকল ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাঁর অতুলণীয় সফলতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব আয়াত ও ঘটনাবলী দৃষ্টে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তিনি (সা.) খাসভাবে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন।

তিনি দুনিয়াতে এই ঘোষণা করেন যে, আমি একটি মহান কাজের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি। সেই সময় হতে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন নি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে তাঁকে জানানো হল যে **'আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম'** (আজ আমি তোমাদের জন্য ধর্ম ব্যবস্থা পূর্ণ করলাম)। যেমন তিনি এই দাবী করেছিলেন "ইন্নি রাসুলুল্লাহে ইলাইকুম জামীয়ান" (হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি।) তেমনি এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী ছিল যে, সমস্ত জগতের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হত। তিনি কিরূপ সাহসিকতা ও বিরত্বের সাথে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, **"ফাকীদূনি জামিয়ান"** অর্থাৎ সকলে মিলিতভাবে সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি ফিকির কর এবং কোন কিছুই বাদ দিওনা। কতল করার, দেশান্তরিত করার যাবতীয় তদবীর কর! কিন্তু স্মরন রেখো যে **"সা ইউহ্‌যামুল জাম্‌উ ওয়া ইউওয়াল্লুনাদ্ দুবর"**–অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয় আমার জন্যই অবাধারিত। তোমাদের সকল তদবীর ষড়যন্ত্র ধুরিস্যাত হবে, তোমাদের সকল সংস্থা ও যৌথ প্রচেষ্টা এবং জনবল বিক্ষিপ্ত ও ব্যর্থ হবে এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। যেমন এই মহান দাবী **"ইন্নি রাসুলুল্লাহে ইলাইকুম জামীয়ান"** (হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি) এ দাবী আর কেউই পেশ করে নাই এবং যেমন **"ফাকীদূনি জামিয়ান"** ঘোষণা করারও আর কারও সাহস হয়নি তেমনিভাবে অন্য কারও মুখে এটাও উচ্চারণ হয়নি যে **"সা ইউহ্‌যামূল জাম্‌উ ও ইউওয়াল্লুনাদ্ দুবর"** (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী সকল দল পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে) এই কথা কেবল সেই ব্যক্তির মুখ থেকেই নিসৃত হয়েছিল, যিনি ছিলেন খোদা তাআলার ছায়ার নীচে উলুহিয়াতের (ঐশ্বরিক) চাদরে আবৃত। **আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা মুহাম্মাদেন ওয়া আলে মুহাম্মদ** । ('আল হাকাম' ২৪ জুলাই ১৯০২ ইং)

সমগ্র বিশ্বের আহমদীদেরকে আর আপনাদেরকে ঈদের মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এ ঈদ যেন আমাদের সবার জন্য অবারিত আনন্দের ধারা নিয়ে আসে। আর আমরা সবাই যেন সর্বদা একে অন্যের সাথে ভালবাসা, সহমর্মিতা, ও সহযোগিতার ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকি

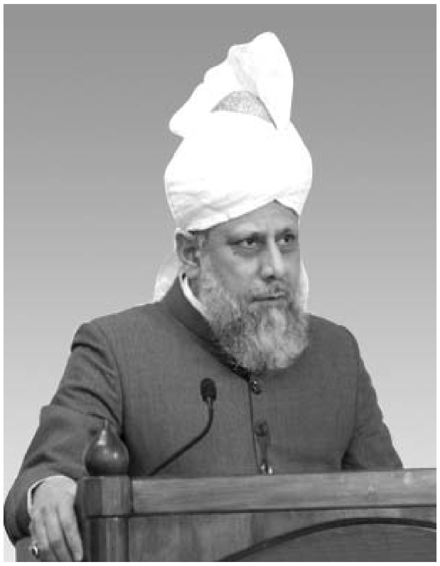

১৩ অক্টোবর ২০০৭ ইং হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস কর্তৃক মসজিদে বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

আজ আল্লাহ্ তাআলার ফযলে তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমরা ঈদ উদযাপন করতে যাচ্ছি। এ ঈদকে ঈদুল ফিতর বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলার আদেশে এক মাস রোযা রাখার পর তাঁর আদেশেই আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করছি। আমরা আমাদের তাক্ওয়া ও ঈমানকে বাড়ানোর জন্য এক মাস রোযা রেখেছি।

আমরা রমযানের রোযা এজন্য রেখেছি–যেন তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারি। তাক্ওয়া বাড়ানোকারী হতে পারি। এ মাস পূর্ণ হওয়ার পর, এ কুরবানী ও রোযা পূর্ণ করার পর আল্লাহ্ তাআলা আজ আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আনন্দ উৎসব কর। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা থেকে তোমাদেরকে এক নির্ধারিত সময় বিরত রাখা হয়েছিল তা কর। খাও, আনন্দ কর, নতুন কাপড় পড়, সুগন্ধি লাগাও। কিন্তু আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার অবকাশ নেই। কৃতজ্ঞতার সর্বোত্তম পন্থা হলো –মসজিদে একত্রিত হয়ে ঈদের নামায পড়। এতে রমযানের রোযার ও কুরবানীর (ত্যাগের) আকারে যে নেকী করেছ বা করার তৌফিক পেয়েছ, এর কৃতজ্ঞতা আদায় কর। সুতরাং এ ঈদ ভাল খাওয়ার ও পরার এবং বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় আনন্দ ভ্রমণ করার নাম নয়। বরং কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য একটা বিশেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ ঈদ দান করেছেন। তাই এতে শুকরিয়া আদায় কর। এ ঈদ হাসি খুশি, রং তামাশা, খাওয়া দাওয়া ও বন্ধুদের সাথে মজা করার নাম নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলার আদেশে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে পরিপূর্ণ আনুগত্যে সমস্ত বৈধ বিষয় থেকে এক মাস বিরত থাকার পর আল্লাহ্র আদেশে আবার সেগুলো চালু করার নাম। আমাদের ঈদগুলো যেন আমাদেরকে ঐ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়-যে ইবাদতের ও ত্যাগের স্বাদ আমরা লাভ করেছি আর যার ফলশ্রুতিতে আজ আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বিবি বাচ্চা ও জামা'তের সদস্যদের সাথে মিলে আনন্দ করার সুযোগ দিচ্ছেন, এই ত্যাগ ও ইবাদতকে যেন আমরা চিরস্থায়ী করে নেই। যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিটি দিন রোযার ঈদ হয়ে উদিত হয়। কেবল মাত্র বছরে একটি দিনের মধ্যে যেন সেটা সীমাবদ্ধ না থাকে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শরীয়তের যে বিধান দান করেছেন সেটা নিয়মিত পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে গরীবদের প্রতি, অভাবীদের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ রয়েছে। ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ রয়েছে। নিজের তাক্ওয়ার মানকে উন্নত করার নির্দেশ রয়েছে। এ রমযান, যাতে আমাদেরকে ক্ষুধার্ত থাকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, অন্যদের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য মনোযোগ আকৃষ্ট

করা হয়েছে। ফিদিয়া, ফিৎরানা ও অন্যান্য আর্থিক কুরবানীর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, নফল ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, ফরয নামায সময়মত আদায়ের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে, পুরা কুরআন তেলাওয়াতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে আর এরপর পুরো মাস অতিক্রম করার পর এ খুশির দিন পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা এজন্য, যেন আমাদের বোধগম্য হয়–আসল খুশি ও আনন্দ কখন লাভ হয়? তখন, যখন মানুষ এমন কর্মের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। গরীবদের ক্ষুধার জ্বালা তখনই অনুভব হয় যখন মানুষ নিজে ক্ষুধার্ত থাকে। না খেয়ে থাকার কষ্ট মানুষ তখনই বুঝতে পারে যখন রোযা রাখার ফলে বিকাল বেলা ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা অনুভূত হয়। আমি তাদের কথা বলছি যারা রোযার নিয়্যতে রোযা রাখে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে রাখে। আল্লাহ্‌র ফযলে জামাআতের অধিকাংশই এ নিয়্যত ও উদ্দেশ্যেই রোযা রাখে। আমি তাদের কথা বলছি না –যারা সেহরীর সময় এতোই খায় যে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের খাবারের ঢেকুর আসতে থাকে। আর ইফতারের সময় এতো খায় যে ঘরের লোকেরা সেহরীতে তাকে অনেক কষ্টে ডেকে উঠায়। না নফলের হুঁশ রয়েছে, না কুরআন তেলাওয়াতের, না নামাযের চিন্তা রয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক জায়গায় বর্ণনা করছেন–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটা বলতেন, একবার বাজারে কয়েকজন দোকানদার বসে কথাবার্তা বলছিল–যে এক পোয়া তেল খেতে পারবে তাকে ৫ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। তখন এক কৃষক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো – এটা কোন বিষয় হলো- এক পোয়া তেল! তেল কি, খালি তেল না বোতলসহ খেতে হবে? সে ভাবলো এতো বড় পুরস্কার হয়তো শুধুমাত্র তেল খাওয়া হবে না । তখন দোকানদার বললো- চৌধুরী সাহেব আপনি যান। আমরা আপনার কথা নয়, আমরা আমাদের কথা বলছি।

আমিও ঐ লোকদের কথা বলছি। যারা মু'মিন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য রোযা রাখেন। এজন্য নয়- ভাল হয়েছে রমযান এসেছে, সন্ধ্যা ও ভোরে ভাল ভাল খাবার খাওয়া যাবে। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য রোযা রাখেন, তাদের মনে অন্যের জন্য সহানুভূতির জন্ম হয়। রমযান তাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে। আর এ পরিবর্তন-ই তাদেরকে ঈদের প্রকৃত আনন্দের স্বাদ অনুভব করায়।

এ ঈদ যা আমরা পালন করছি, এটা এ নিয়্যতে উদযাপন করা উচিত- যাতে আমাদের সৃষ্টিকারী খোদার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, খোদার ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। সর্বদা এটা আমাদের চিন্তা চেতনায় জাগ্রত রাখা উচিত, নেকী ও তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলন করা এটা আমাদের আসল উদ্দেশ্য। এ শিক্ষাই আমাদেরকে রমযানের রোযা আর ঈদ দেয়। দু'টিই আমাদেরকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আমরা রোযা রাখি, ঈদ উদযাপন করি, সবই আল্লাহ্‌র আনুগত্যেই করে থাকি। আজ যে ঈদ উদযাপন এটাও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ফলশ্রুতিতেই।

সুতরাং এ আয়াতের শিক্ষা এখন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যাওয়া উচিত। এ আয়াতই আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভকারী বানাবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এক জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর তাক্ওয়া অবলম্বন করে তারা সফলকাম হয়।

সুতরাং আমাদের সফলতা, আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে, তাঁর তাক্ওয়া অবলম্বনের মধ্যে নিহিত রয়েছে, অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ নীতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবো–ততক্ষণ আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী হতে থাকবো। আল্লাহ্‌র পুরস্কার ও অনুগ্রহে সিক্ত হতে থাকবো। সুতরাং এ শিক্ষাকে কখনও কোন আহমদীর ভুলা উচিত নয়। কিন্তু শুধু মুখে বলা আমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করছি, আমরা আনুগত্য করছি এটা যথেষ্ট নয়। এটা অর্জনের জন্য যে মাধ্যমগুলোর কথা আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বলেছেন, সেগুলো ব্যবহারের চেষ্টা করা উচিত। এটা করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য ফরয।

এখন যে **হুকুকুল ইবাদ** (বান্দার অধিকার)-এর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে

এটা আইন হওয়া উচিত, যেন দুর্বল ভাইদের সাহায্য করা হয়। আর তাদেরকে শক্তি যোগানো হয়। দুই ভাই। একজন সাঁতার জানে অপরজন জানে না। তাহলে অপরজনের কি দায়িত্ব, যে সাঁতার জানে না, তাকে উদ্ধার করা না তাকে ডুবতে দেওয়া? তার জন্য আবশ্যক যেন সে তার ভাইকে উদ্ধার করে।

সেগুলো আজ তুলে ধরবো। আমাদের মধ্যে এই অধিকারের প্রতি যে দৃষ্টি দিবে না, সে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হবে না। বান্দার অধিকারের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,–

"এটা আইন হওয়া উচিত, যেন দুর্বল ভাইদের সাহায্য করা হয়। আর তাদেরকে শক্তি যোগানো হয়। দুই ভাই–একজন সাঁতার জানে অপরজন জানে না। তাহলে অপরজনের কি দায়িত্ব, যে সাঁতার জানে না, তাকে উদ্ধার করা না তাকে ডুবতে দেওয়া? তার জন্য আবশ্যক যেন সে তার ভাইকে উদ্ধার করে। এজন্য পবিত্র কুরআনে এসেছে।

তাআওয়ানু আলাল বিররে ওয়াত তাক্ওয়া

নিজের দূর্বল ভাইদের বোঝা উঠাও। তাদের সাহায্য কর। তাদের আর্থিক বোঝা হালকা কর। তাদের শারীরিক দুর্বলতা দূর কর। কোন জামাআত জামাআত হতে পারে না যতক্ষণ দুর্বলদেরকে শক্তিশালীরা সাহায্য না করে। তিনি আরও বলেন–আমি অনেককে দেখছি–যাদের ভাইদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। যদি এক ভাই ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে তার অন্য ভাই তার খোঁজ নেয় না। অথবা যদি এক ভাই অন্য কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়, তাহলে সে তার ভাইয়ের জন্য টাকা পয়সা খরচ করে না। হাদীস শরীফে প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ এসেছে। এমনকি এটাও বলা হয়েছে যদি তোমরা মাংস রান্না কর, তাতে ঝোল বেশী দাও, যেন তাদেরকে দিতে পার। কিন্তু হচ্ছে কি, শুধু নিজের পেট ভরা নিয়ে ব্যস্ত। এটা মনে করো না যে, ঘরের পাশে যে রয়েছে শুধু সে-ই প্রতিবেশী। বরং যে তোমার ভাই সেও তোমার প্রতিবেশী। সে যদিও দুইশত ক্রোশ দূরত্বে থাকে।

সুতরাং জামাআতের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা নিজেদের মাঝে দুর্বলদের প্রতি দৃষ্টি রাখি। আর দৃষ্টি তখন রাখা সম্ভব যখন জামাআতের সদস্যরা এর গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হবে। এ অনুভূতি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করুন। আমাদের ঈদ তখন প্রকৃত ঈদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে যখন আমরা একে অন্যের দুঃখকে অনুভব করতে সক্ষম হবো। প্রত্যেক আহমদীর পক্ষে সম্ভব নয় দুইশ মাইল দূরে গিয়ে সে অন্যের খবর নেয়, বিশেষ করে সে যাকে চিনেই না। অথবা অন্যদেশের ব্যাপারেও জ্ঞান রাখবে না সেখানে কে কি অবস্থায় রয়েছে? এটা নেযামে জামাআতের পক্ষেই সম্ভব বলা, কে কোথায় কেমন অবস্থায় আছে? কতটুকু সাহায্যের প্রয়োজন? আল্লাহ্ তাআলার ফযলে দুই ঈদ ও বিভিন্ন সময়েও সাহায্য সহযোগিতা ও দেয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক জায়গায় দুর্বলতা থেকে যায়। তবুও বস্তুত জামাআত চেষ্টা করে থাকে যেন গরীবদের সাহায্য করা হয়। জামাতের খুলাফাগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তাহরীকও করতে থাকেন আর ঐ তাহরীক আজও চালু আছে। আজ আমরা ঈদ উদযাপন করছি কিন্তু আমরা অনেকেই বিশ্বের খবর রাখি না, তারা কি অবস্থায় আছে? নিজেদের কষ্টে বিচলিত, নিজেদের ব্যবসার সমস্যায় বিচলিত, যেটা তাদের মুকাবেলায় কোন ভূমিকাই রাখে না যার মধ্য দিয়ে জগতের এক বড় জনগোষ্ঠি দিনাতিপাত করছে। এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাআতের ওপর আল্লাহ্ তাআলার ফযল। আল্লাহ্র ফযলে আহমদীদের অবস্থা এরকম খারাপ নয়। তবে ঠিক, কখনো কখনো কারো অবস্থা খারাপ হয়। কিন্তু যখন আমাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনার কাছে সংবাদ আসে, আমি কোন ভাবে তাদের খারাপ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হই তখন তাদেরকে সাহায্য করা হয়। এটা কারো ওপর অনুগ্রহ নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ লাভের জন্য করা হয়।

জগতের খারাপ অবস্থার কথা আমি বর্ণনা করছি। কয়েকদিন হলো একটি সংবাদ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে– এক হিসেব অনুযায়ী প্রায় ৮ শ মিলিয়ন লোক অর্থাৎ আশি কোটি মানুষ প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থাকে। অতএব আহমদীরা সৌভাগ্যবান, তাদেরকে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। যেভাবে আমি

নিজের দূর্বল ভাইদের বোঝা উঠাও। তাদের সাহায্য কর। তাদের আর্থিক বোঝা হালকা কর। তাদের শারীরিক দুর্বলতা দূর কর। কোন জামাআত জামাআত হতে পারে না যতক্ষণ দুর্বলদেরকে শক্তিশালীরা সাহায্য না করে। তিনি আরও বলেন–আমি অনেককে দেখছি–যাদের ভাইদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। যদি এক ভাই ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে তার অন্য ভাই তার খোঁজ নেয় না। অথবা যদি এক ভাই অন্য কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়, তাহলে সে তার ভাইয়ের জন্য টাকা পয়সা খরচ করে না।

বলেছি- জামা'তের খলীফাগণের বিভিন্ন তাহরীক রয়েছে বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানোর জন্য। এগুলোতে অংশ গ্রহণ করা উচিত যাতে অভাবীদের সাহায্য করা যায়। তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর তাহরীক অনুযায়ী গরীব ভাইদেরকে সাহায্য করার জন্য লোকেরা তাদের প্রতি খেয়াল রাখছেন। তাদের প্রয়োজনকে, চাহিদাকে পূরণ করছেন, গরীব প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রাখছেন। ঈদের দিন মিষ্টি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে তাদের ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা ঈদের সাময়িক খুশি যাতে আহমদীরা শামিল হচ্ছেন। অবশ্যই তাতে সবাইকে শামিল হওয়া উচিত। জামাআতের ব্যবস্থাপনাকেও এতে শামিল হওয়া উচিত। কিন্তু গরীবদের এ ছাড়াও এমন কিছু প্রয়োজন রয়েছে যা ঈদের পরের দিনগুলোতে বিস্তৃত রয়েছে তার প্রতিও খেয়াল রাখা উচিত। সামর্থ্যবানদের নসিহত করছি- তাতে আরও অনেক বেশি আপনাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। এছাড়াও সাধারণভাবে অন্যান্য আহমদীরা যারা ভাল অবস্থানে রয়েছেন, যারা এতে অংশ নিতে পারেন তাদের অবশ্যই অংশ নেয়া উচিত। আমরা যখন পুরোপুরি স্থায়ীভাবে আমাদের গরীব ভাইদের অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো তখনই এটা আমাদের প্রকৃত ঈদ উদযাপন হবে। সুতরাং আমাদের এতে খুশী হওয়া উচিত নয়, আমরা গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বরং স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। নিজের বাচ্চাদেরকে ঈদের এ মাহেন্দ্রক্ষণে গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া উচিত। তাদেরকে ঈদের যে উপহার দেয়া হয়, তা থেকে যেন তারা একটা অংশ গরীবদের জন্য পৃথক করে নেয়। তারা যেন শুধু নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিই খেয়াল না রাখে, নিজেরাই যেন চকলেট ইত্যাদি না খায়, সাথে সাথে গরীব বাচ্চা যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রয়েছে তাদের প্রতিও যেন তারা খেয়াল রাখে, পৃথিবীতে আজ অনেক ধনী লোক ও ধনী দেশ রয়েছে যাদের দখলে সম্পদের বিশাল পাহাড় রয়েছে। কিন্তু পক্ষান্তরে বিশ্বের গরীব দেশগুলো তাদের অধিবাসীদের খাবার যোগাতে পারছে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তা পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ধনী দেশের শর্ত তারা না মানবে, দাসত্বের শিকল গলায় না জড়াবে। কিন্তু আমাদের ও আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে এ সহানুভূতি সৃষ্টি করা উচিত, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গরীবদের সাহায্য করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়। আমাদের সমগ্র বিশ্ববাসীর সেবা করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত নয় তাদের ধর্ম কি? এ আবেগ-অনুভূতি হৃদয়ে গেঁথে নেয়া উচিত আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনই হচ্ছে আসল বিষয়।

আমরা যখন পুরোপুরি স্থায়ীভাবে আমাদের গরীব ভাইদের অভাব দূরীকরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো তখনই এটা আমাদের প্রকৃত ঈদ উদযাপন হবে। সুতরাং আমাদের এতে খুশী হওয়া উচিত নয়, আমরা গরীবদের সাময়িক খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বরং স্থায়ী খুশির উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে যেভাবে প্রথমে আমি বলেছি– জামা'তে এ কাজ হচ্ছে। আমাদের চেরেটি অর্গানাইজেশন রয়েছে হিউম্যানিটি ফার্স্ট। এটি মানবতার সেবায় এক বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কম উপকরণ হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ এক বিশেষ আবেগে সেবা করে যাচ্ছেন। বর্তমানে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বন্যা হয়েছে। সেখানে অনেক দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর কর্মীগণ ইউরোপীয় দেশ থেকে গিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ জার্মানী থেকে এক টিম বেনীনে গিয়েছেন। জনগণকে চিকিৎসা সেবা ও অন্যান্য জিনিসপত্র তারা দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য অর্গানাইজেশন যারা রয়েছে তাদের হাতে বিপুল দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে, যারা অনেক পুরাতন। তারা সেখানে গিয়ে গাড়িতে বসে রয়েছে, তারা সব জায়গায় যাচ্ছে না। কিছু এমন জায়গা রয়েছে যেখানে যাওয়াটাও খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। জীবন বাজি রেখে যেতে হয়। কিন্তু গরীবদের প্রতি সহানুভূতির খাতিরে জামা'তের সদস্যরা এর কোন পরোয়াই করছেন না। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে নিরাপদে রাখুন, হেফাযত করুন। ঐ লোকেরা যখন সেখান থেকে চিঠি লিখেন- তখন তা পাঠ করে মনে হয়, এটাই আসল খুশি, এটাই আসল আনন্দ যা তারা লাভ করছেন। এর জন্য এক মু'মিন চেষ্টা করে থাকেন।

অতএব আমাদের আসল আনন্দ মানব সেবার মাঝেই। হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটি রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠান। এতে আহমদীরা চাঁদা দেন আর অন্যান্যদের জন্য খরচ করা হয়। এখন পৃথিবীর সমস্ত বড় দেশে এটি রেজিষ্ট্রেশনকৃত। বরং আমি যেভাবে জলসায় বলেছিলাম- জাতিসংঘ মানব সেবার বিষয় পর্যবেক্ষণ

করতে গিয়ে তাদের এনজিওগুলোর সাথে হিউম্যানিটি ফার্স্টকে তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে। আর আমাদের যে রিপোর্ট সেখানে পাঠ করা হয়-তাতে জানা যায় অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে হিউম্যানিটি ফার্স্ট অনেক বেশী কাজ করেছে। এটা এজন্য সম্ভব হচ্ছে আহমদীরা এক বিশেষ আবেগ ও চিন্তা নিয়ে কাজ করে থাকেন। তা হলো- আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের একটা মাধ্যম। এটা আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের একটি নির্দেশ। আহমদীরা আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালন করতে গিয়েই এ কাজ করে থাকেন। আহমদীরা এ নির্দেশের ওপর আমল করতে গিয়ে কাজ করেন –

ওয়া ইউতিমুনাত্‌তোয়ামা আলা হুব্বিহি ওমিসলিকুনহু ও ইয়তিমুহু আসিরা

অর্থাৎ তারা মিসকীন ও বন্দীদের এ জন্য খাওয়ায় যেন তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করে তাঁর আদেশের অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারে। সুতরাং যারা এ চিন্তা নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে অন্যরা কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। আমরা এক-এক পয়সা যা খেদমতে খালকের (সৃষ্টির সেবার) জন্য পেয়ে থাকি তা ঐ কাজের জন্যই খরচ করে থাকি। অনেক স্বেচ্ছাসেবক তো দূর-দূরান্তে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নিজের পকেট থেকে খরচ করে থাকেন যাতে বেশি বেশি টাকা অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য খরচ হয়।

আমার স্মরণ আছে, আমি যখন ঘানাতে ছিলাম, সেখানে এক পশ্চিমা দেশের অনেক বড় প্রজেক্ট তাদের ঘানার জনগণের সেবার জন্য এসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্রতা দূর করা। তারা অগণিত কর্মচারী কর্মকর্তা রেখেছিল। ইউরোপ থেকে লোকেরা সেখানে এসেছিল। সুন্দর সুন্দর বিলাস বহুল এয়ারকন্ডিশনাল ঘর তারা ঐ জঙ্গলের মধ্যে বানিয়েছিল। অসংখ্য ‘কার’ তাদের সাথে ছিল। অনেক গাড়ি ছিল। তাদের মাঝে একজনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি তাকে বললাম, আপনাদের ব্যবস্থাপনা তো খুবই সমৃদ্ধ, এখন পর্যন্ত তো আপনাদের উচিত ছিল- একটি বিরাট এলাকাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া, কিন্তু ঐ এলাকাতে এ রকম কিছুই দৃষ্টিতে আসছে না। সে আমাকে যে হিসাব দিল তাতে দেখা গেল, এই বাজেট যা ঐ প্রজেক্টের জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল, তার প্রায় ৮০-৮৫% তাদের বেতন ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে গিয়েই তাদের হাতে ফিরে যেত। আমি তাকে বললাম, এতে স্থানীয় লোকদের লাভ কি? তাদের কোন লাভ নেই। শুধু তোমাদের পকেট-ই ভরছে। তখন সে উত্তরে বলল, আমরা এখন এ অপেক্ষায়ই আছি, যদি আমরা আরও বেশি পরিমাণ বাজেট পাই তখন আমরা কাজ করবো। কিন্তু লাভ কি! বেশি বাজেট যখন পাবে তখন তো ৮০-৮৫% তাদের পকেটেই চলে যাবে।

এতে আমার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর একটি ঘটনা স্মরণ হলো। তিনি বলেছেন, আমাকে আমার এক আত্মীয় বললেন–তার এক বন্ধু ছিল। সে খুবই মন খারাপ করে বসে রইল। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার কি হয়েছে? তুমি মন খারাপ করে বসে আছ কেন? সে বললো, পরীক্ষা খুবই নিকটবর্তী। আমি আজ নয় কাল, বলতে বলতে নিজের সময় নষ্ট করে ফেলেছি। কোন পড়ালেখা করিনি, প্রস্তুতি নেইনি। এ কারণে আজ আমি আমাকে জরিমানা করেছি যেন আমি পড়া লেখা করি। সে বললো, কি জরিমানা তুমি করেছ ? সে বলল দু’আনা। এটা শুনে লোকটি বললো–ভালই করেছ। দু’আনা কোন মিসকিনকে দিয়ে দিও। সে এটা পেয়ে দোয়া করবে। তখন সে বলল, আসলে তা নয়। আমি জরিমানা এভাবে করেছি সেই দু’আনা দিয়ে মিষ্টি কিনে খেয়ে ফেলেছি–এজন্য আফসোস হচ্ছে এ দু’আনাও নষ্ট হয়েছে আর অন্যেরও কোন উপকার হয়নি।

নিজেকে জরিমানা করে নিজেই খেয়ে ফেলে কমপক্ষে তো তার এটা অনুভব হয়েছে। কিন্তু এখানে বড় বড় কোম্পানী নিজেরা সাহায্যের পুরো ফান্ডটি খেয়ে যাচ্ছে তবুও নিজেদের কোন বোধোদয়ই হচ্ছে না। অন্যান্যদেরও একই অবস্থা। তবে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। বিশেষ করে যারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ করছে। মূলতঃ তারা খুবই ভাল কাজ করে যাচ্ছে।

অতএব আমাদেরকে এটা স্মরণ রাখা উচিত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের আগমনের একটা উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করেছেন–বান্দার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এদিক থেকে আমাদের ওপর এটা এক বড় দায়িত্ব আমরা যেন বয়আতের শর্তের দিকে দৃষ্টি দিয়ে এ উদ্দেশ্যকে পুরা করি। তিনি বয়আতের ৯ নম্বর শর্তে লিখেছেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানবকল্যাণে নিয়োজিত করবে।

অন্য এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মানবজাতির প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা একটা অনেক বড় ইবাদত। এটা আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের একটি অনেক বড় মাধ্যম। সুতরাং অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা,

তাকে সহযোগিতা করা, তার উপকার করা, এগুলো এমন কর্ম যা আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানাবে। এজন্য এটাকে কখনো সাধারণ বিষয় মনে করা উচিত নয়। আর কোন প্রতিদান, কোন আশা কোন অহংকার ছাড়াই অন্যকে সাহায্য করা উচিত। এটা চিন্তা কর, আল্লাহ্ তাআলার এটা আমাদের ওপর অনুগ্রহ তিনি আমাদেরকে গরীব, অসহায়, অভাবী ও অসুস্থদের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। আমাদের ঐ যোগ্যতা দিয়েছেন যেন আমরা অন্যকে দিতে পারি। এতে এ জন্য বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

যেভাবে আমি বলেছি, খেদমতে খালকের জন্য খলীফাগণের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের তাহরীক রয়েছে। আমি এখন সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর মধ্যে একটি রয়েছে **'এতীম ফান্ড'**। যার মাধ্যমে শত শত এতীমকে জামাআত দেখাশুনা করে থাকে। যার মাধ্যমে তাদের কাপড়চোপড়, খাবার, শিক্ষা, বিয়ে শাদী ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখা হয়ে থাকে। আল্লাহ্র ফযলে এর মাধ্যমে হাজার হাজার এতীম উপকৃত হয়েছে। পাকিস্তানেও আর বিশ্বের অন্যান্য গরীব দেশেও। এতীমদের দেখাশুনার বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ঐ দিকে অনেক দৃষ্টি দেয়া উচিত।

আবার **অসুস্থদের সাহায্যের জন্য** একটা স্কীম রয়েছে। এ জন্য পাকিস্তানে তো একটা নিয়মিত ব্যবস্থাপনাই চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে অসুস্থদের হাসপাতালে পাঠানো ও অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়। কাদিয়ানেও এ ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও রয়েছে। তবে সবচে ভাল ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কাদিয়ান ও রাবওয়াতে রয়েছে। আজকাল চিকিৎসা ও ঔষধের দাম অনেক বেড়ে গেছে। তাই অনেক সময় সবার চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না। আর সবার চিকিৎসা দেয়াও সম্ভব হয় না। তাই এমন সদস্য যারা সামর্থ্যবান রয়েছেন, সুস্থ রয়েছেন অথবা অসুস্থ অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন তাদের উচিত এটার কৃতজ্ঞতা আদায় স্বরূপ অসুস্থ ভাইদের চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসা। যদি তারা এটা করেন তাহলে অনেক বড় সংখ্যক অভাবগ্রস্থদের প্রয়োজন মিটানো সম্ভব।

> ***মানবজাতির প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা একটা অনেক বড় ইবাদত। এটা আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের একটি অনেক বড় মাধ্যম। সুতরাং অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, তাকে সহযোগিতা করো, তার উপকার করা, এগুলো এমন কর্ম যা আমাদেরকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানাবে। এজন্য এটাকে কখনো সাধারণ বিষয় মনে করা উচিত নয়। আর কোন প্রতিদান, কোন আশা কোন অহংকার ছাড়াই অন্যকে সাহায্য করা উচিত।***

বাচ্চা জন্ম দেয়ার অবস্থা মহিলারা অতিবাহিত করেন। ঐ মুহূর্তগুলো খুবই কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। তাদেরও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অন্যান্য অসুস্থদের বিষয়টি চিন্তা চেতনায় আসা উচিত। শুধু মিষ্টি ও খাবার খাওয়ানোই আনন্দের কাজ নয়।

আবার **ছাত্রদের সাহায্যের জন্যও** একটি স্কীম রয়েছে। আর এটা খুবই পুরনো স্কীম। এটা অনেক পূর্ব থেকেই জামা'তে চালু রয়েছে। শিক্ষা অর্জনের বিষয়গুলো আজকাল অনেক ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। এটা উন্নত দেশগুলোতেও। এজন্য যাদের অনেক সন্তান রয়েছে তাদের সন্তানদের পড়ালেখা করানোটা খুবই কষ্টকর হয়ে গেছে। এজন্য যারা সামর্থ্যবান রয়েছেন–তাদের সন্তানগণ পরীক্ষায় পাশ করার পর তারা যদি এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ ফান্ডে চাঁদা দেন। তাহলে তা দিয়ে অনেক গরীব ছাত্রের চাহিদা পূরণ করা যাবে। এখানকার প্রত্যেক কৃতকার্য ছাত্র যদি বছরে ১০/১৫ পাউন্ড, যা কোন কোন মাসে সে বাজার থেকে কোন খাবার কিনে খেয়ে থাকে তা দান করে তাহলে এ টাকা দিয়ে গরীব দেশের একজন ছাত্রের সারা বছরের কাগজ, কলম ও বইপত্রের খরচ মিটানো সম্ভব। আর এটাই আসল ঈদের খুশি ও আনন্দ। আমাদের জন্য এটাই আসল ঈদের খুশি হওয়া উচিত। এ অনুভূতি সন্তানদের হৃদয়ে সৃষ্টি করা উচিত তারা যেন গরীবদের সাহায্য করে; গরীবদের প্রতি খেয়াল রাখে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর বিয়ে শাদীর কাজে সাহায্যের জন্য একটি তাহরীক রয়েছে **মরিয়ম শাদী ফান্ডের**। এতে যদি বাহিরের দেশে অবস্থানকারী সদস্যরা চাঁদা দেন তাহলে অনেক গরীব মেয়েদের বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রথম হুযূর (রাহে.) যখন তাহরীক করেছেন তখন বিভিন্ন দেশ থেকে ওয়াদা এসেছে। কিন্তু তা একবার করেই বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও জামা'ত এ কাজে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে তাদের কাছে এ ফান্ডে টাকা থাক বা না থাক। কিন্তু এতে পুরোপুরি প্রয়োজন

মিটানো যাচ্ছে না। তাই সামর্থ্যবানগণ যদি তাদের সন্তানদের বিয়েশাদীর সময় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। তাহলে একদিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের ফলে তারা নেকী পাবেন। অন্যদিকে তাদের সাহায্যের ফলে যাদের প্রয়োজন মিটবে, উপকার হবে, তাদের দোয়ার ফলে এই সন্তানদের ঘরও সুখের হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের ঘরে শান্তি দিবেন, বরকত শামিল করবেন। আল্লাহ্‌র ফযলে অনেক আহমদী এমন রয়েছেন যাদের হৃদয়ে এ অনুভূতি রয়েছে। তারা নিজেদের এক সন্তানের বিয়ে উপলক্ষে দশ গরীবের বিয়ের খরচ বহন করে থাকেন। অনেকে অযথা খরচ করেন। ২ লক্ষ টাকার বিয়ের পোষাক পরিচ্ছদ বানিয়ে নেন। কিন্তু এ টাকায় ৫ গরীব বাচ্চার অলংকার বানানো সম্ভব। তাই তাদের অবশ্যই এটা চিন্তা করা উচিত, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে এত মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ, গহনাপাতি বানানোর সামর্থ্য দিয়েছেন। এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোন গরীবের সাধারণ গহনার ব্যবস্থা তাদের করে দেয়া উচিত। যাতে সে গরীবদের খুশিতে শরীক হতে পারে, তাদের দোয়া নিতে পারে। এই যে দামী পোষাক পরিচ্ছদ, তা তো এক দুই বার পরেই নষ্ট হয়ে যায় আর এটা কোন কাজে আসে না। কিন্তু গরীবের দোয়া ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এটা সর্বদা সঙ্গ দেয়ার মত জিনিস।

বুয়ূতুল হামদ স্কীম রয়েছে। এটিও হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে (রাহে.) চালু করেছেন। যাতে শুরুতে রাবওয়াতে ১০০ ঘর বানিয়ে গরীব ও অভাবীদের দেয়ার কথা ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলার ফযলে এটা পূর্ণ হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায়, লোকদের ঘরের মধ্যেই কোন কামরা বানিয়ে তা গরীবদেরকে দেয়া হচ্ছে। কাদিয়ানেও বুয়ূতুল হামদ-এর অধীনে ঘর বানানো হয়েছে। পাকিস্তানেও আর বিভিন্ন দেশেও বাড়ি ঘর বানিয়ে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে তা দেয়া হচ্ছে। এটাও এমন এক কাজ যার দিকে আহমদীদের দৃষ্টি দেয়া উচিত। আল্লাহ্‌র ফযলে অনেক আহমদী রয়েছেন যারা যখন নিজের ঘর বানান তখন এ তাহরীকেও অংশ নিয়ে থাকেন। অনেকে নিজের জন্য খুবই বিলাসবহুল ঘর বানিয়েছেন। আর সাথে সাথে বুয়ূতুল হামদের এক ঘরের খরচও বহন করেছেন। এখন যদি সারা পৃথিবীর আহমদীদের নিজেদের ঘর বানানোর সময়-এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়, তারা কিছু না কিছু সাহায্য করেন, তাহলে তা দিয়ে অনেক গরীব আহমদীকে সাহায্য করা যাবে।

অতএব গরীবদের সাহায্যের জন্য এ কতিপয় স্কীমের কথা আমি উল্লেখ করলাম। এ গুলোতে আমাদের অংশ নেয়া উচিত। আমাদের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী ঈদ তখনই হবে যখন আমরা একে অন্যের ব্যথা অনুভব করে, এক জামা'ত হয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি দিব, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করবো তখনই আমরা হাদীস অনুযায়ী নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে দাবী করতে পারবো, যার সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন–তারা এক দেহের ন্যায়। যখন দেহের কোন এক অংশে ব্যথা হয়, সাথে সাথে অন্যান্য অংশেও তা অনুভূত হয়। অতএব এ ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক আহমদীকে চেষ্টা করা উচিত। প্রকৃত ও চিরস্থায়ী ঈদ তখনই হবে যখন আমরা একে অন্যের খুশির উপকরণ পৌঁছানোর সর্বাত্মক চেষ্টায় রত থাকবো। আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন দোয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাচ্ছি। দোয়াতে নিজের গরীব, অভাবী, অসুস্থ, অসহায়, ভাইদেরকে স্মরণ রাখবেন। ধর্মের সেবায় নিয়োজিত ভাইদেরকে স্মরণ রাখবেন। আর্থিক কুরবানীকারীদেরকে স্মরণ রাখবেন। সমস্ত ওয়াকফে জিন্দেগীদেরকে স্মরণ রাখবেন। শহীদদের পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা যেন তাদের হিফাযতকারী ও সাহায্যকারী হন। আর সর্বদা তাদেরকে অনুগ্রহ রাজিতে ভূষিত করেন। কোন অবস্থাতে যেন তাদের মাঝে তারা নিঃস্ব ও এতীম এ অনুভূতি সৃষ্টি না হয়। আসীরানদের (ধর্মের জন্য বন্দী) জন্য দোয়া করবেন। এমন অনেক আহমদী রয়েছেন, যারা অনেক দিন থেকে জেলে রয়েছেন শুধু এ অপরাধের কারণে যে, তারা ঘোষণা দিয়েছেন 'আমরা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেছি'। তাদের মুক্তির জন্য দোয়া করুন। যেন তারাও আমাদের সাথে ঈদ উদযাপন করতে পারেন। উম্মতে মুসলেমার জন্য দোয়া করুন। বর্তমানে খুবই ভয়ানকভাবে তারা দাজ্জালের জালে ফেঁসে গেছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না, তারা কি অবস্থায় আছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিন। যাতে তারা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)কে চিনতে সক্ষম হয়। আর প্রকৃত ঈদের খুশি উদযাপনকারী হতে পারে।

সমগ্র বিশ্বের আহমদীদেরকে আর আপনাদেরকে ঈদের মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এ ঈদ যেন আমাদের সবার জন্য অবারিত আনন্দের ধারা নিয়ে আসে। আর আমরা সবাই যেন সর্বদা একে অন্যের সাথে ভালবাসা, সহমর্মিতা, ও সহযোগিতার ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকি। (পুন:মুদ্রিত)

অনুবাদ ঃ

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

প্রতিটি জাতিতে ও প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী প্রেরণ করেছেন। আর বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং তিনি (সা.)-এর সাথে গভীর প্রেম ও ভালবাসার কারণে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে প্রেরণ করেছেন। সে-ই ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) পূর্বেই এ ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি মাহ্দী হবেন

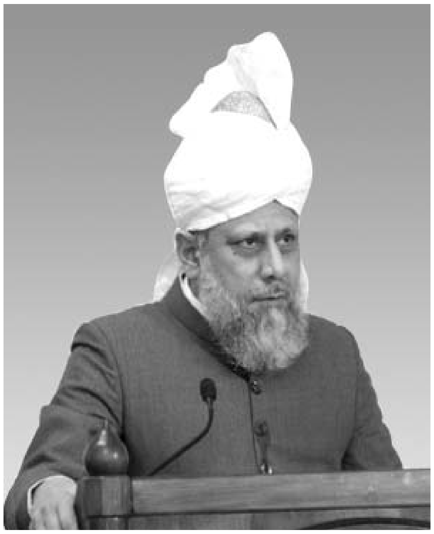

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৭ আগষ্ট, ২০০৯-এর (৭ ওফা, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ] (آمين)

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

(সূরা আল্ মো'মেন:১৬)

যিনি **রাফিয়ুদ্দারাজাত** (মর্যাদা বৃদ্ধিকারী), অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি তাঁর পছন্দ মোতাবেক যার উপর চান আদেশ-বাণী অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ তিনি সেই বাণীসহ প্রেরণ করেন যা আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চারী বাণী হয়ে থাকে, যা আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদের জীবিত করে এবং তাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করে যে, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং এ পৃথিবী হতে বিদায় নেয়ার পরই স্থায়ী জীবন আরম্ভ হয়ে থাকে। তাই পরীক্ষাস্থল– এই পৃথিবীতে এমন সব কাজ কর যা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়।

প্রতিটি জাতিতে ও প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী প্রেরণ করেছেন। আর বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং তিনি (সা.)-এর সাথে গভীর প্রেম ও ভালবাসার কারণে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীকে প্রেরণ করেছেন। সে-ই ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) পূর্বেই এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি মাহ্দী হবেন। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত হবেন এবং ইসলামের বিকৃত অবস্থা শুধরানোর জন্য তিনি আবির্ভূত হবেন। অতএব এই রূহ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার সেই পবিত্র কালাম (বাক্যালাপ), যা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাদের সাথে করেন। এটিই আধ্যাত্মিক জীবনের পাথেয় যা মানুষকে সহজ-সরল পথে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহামও হয়েছে,

يُلقي الروح على من يشاء من عباده

(ইয়ুলকীর রূহা আলা মাইয়্যাশাউ মিন ইবাদিহী)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অর্থ করেছেন, তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার উপর তিনি তাঁর রূহ অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ তাঁকে নবুয়তের পদমর্যাদা দান করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরেকটি ইলহাম রয়েছে; আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলেছেন:

أنت مني بمنزلة روحي

(আনতা মিন্নি বে মানযিলাতির্ রূহী)

অর্থাৎ তুমি আমার রূহ সমতুল্য।

অতএব এটি আল্লাহ্ তাআলার কাজ, তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাদের মধ্য হতে যার উপর চান তাঁর প্রতি এই রূহ অবতীর্ণ করে তাঁর মর্যাদা উন্নীত করেন। যা পবিত্র কুরআনের একস্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

(সূরা আল্ আন'আম:৮৪)

অর্থাৎ আমরা যাকে চাই পদমর্যাদায় উন্নীত করি, তোমার প্রভু-প্রতিপালক অবশ্যই পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী। অতএব উচ্চমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই দান করে থাকেন। এ পৃথিবীতে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য তাঁর নবী, আউলিয়া এবং নৈকট্য প্রাপ্তদেরকে প্রেরণ করে থাকেন, একইসাথে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তিনি পরম প্রজ্ঞার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞানীও।

উৎকর্ষ, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে, তিনি কখন, কাদের মধ্য থেকে কাকে তাঁর বিশেষ বাণীসহ পৃথিবীর মানুষকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্য প্রেরণ করবেন। সেই পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মসীহ্ ও মাহদীরূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনেও তাঁর আখারীনদের মাঝে আবির্ভূত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মসীহ্ ও মাহদীর অবস্থান, মর্যাদা এবং একটি বিশেষ নিদর্শনের কথা বলে মহানবী (সা.) উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে তাঁকে মেনে নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর এ বাণীকে মুসলমানরা যদি গভীর মনোযোগের সাথে এবং স্বচ্ছ মনমানসিকতা নিয়ে পাঠ করতো ও শুনতো তবে মহানবী (সা.)-এর এই প্রকৃত প্রেমিকের বিরোধিতা তারা কখনই করত না বরং তাঁকে কবুল করার প্রতি মনোযোগ দিত। মহানবী (সা.) মসীহ্'কে নবী ও তাঁর খলীফার মর্যাদা দান করেছেন এবং বলেছেন, যারাই তাঁর সন্ধান পাবে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে।

এ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটা বিস্তারিত হাদীসও অন্যান্য পুস্তকে রয়েছে। তিবরানীর– মো'জেমুল কবীর, আবু দাউদ এবং মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেও আছে। এরপর তিনি (সা.) তাঁর মাহদী সম্পর্কে যিনি মসীহ্ও, একটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন যা সুনানে দার কুত্বনীতে রয়েছে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন বাকের (হযরত ইমাম হুসাইনের পৌত্র ও হযরত ইমাম আলী জয়নুল আবেদীনের পুত্র) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন আমাদের মাহ্দীর সত্যতার দু'টি নিদর্শন রয়েছে যা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি অবধি অন্য কারো সত্যতা প্রমাণের জন্য এভাবে প্রদর্শিত হয়নি অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণের প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে। তিনি (সা.) বলেছেন আল্লাহ্ তাআলা যখন থেকে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন– নিদর্শনরূপে তা এর পূর্বে কখনো প্রদর্শিত হয়নি।

সুতরাং এক্ষেত্রে এই মর্যাদাকে সুস্পষ্ট করার জন্য মহানবী (সা.) একটি অসাধারণ ঐশী নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা অত্যন্ত মহিমার সাথে ১৮৯৪ সনে পূর্ণ হয়েছে। সেখানে **'লে মাহ্দীঈনা'** অর্থাৎ 'আমাদের মাহ্দীর জন্য' শব্দ ব্যবহার করেছেন। **'ইন্না লে মাহ্দীইনা আয়াতাইনে'** অর্থাৎ আমাদের মাহ্দীর জন্য দু'টি নিদর্শন রয়েছে। এখানে 'আমাদের মাহ্দী' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি (সা.) তার (মসীহ্র) প্রতি স্বীয় ভালবাসা ও নৈকট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এখন আমি এ বিষয়টি বলতে চাই, মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে যাঁরই আসার কথা ছিল তাঁর একটা মর্যাদা আছে এবং তাঁর আগমনের লক্ষণাবলীই পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সমর্থনে আমরা এসব নিদর্শনাবলী (পূর্ণ হতে) দেখতে পাই। আর এগুলো দেখে একজন পুণ্য স্বভাবের মানুষ আহমদীয়া জামাতভূক্ত হয়। তাঁর এই মর্যাদা অনুসারে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সাহায্যের কি-কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর তাঁকে মহান মর্যাদা প্রদানের কীরূপ অঙ্গীকার করেছেন এবার তা শুনুন। এই অঙ্গীকার তাঁর দাবীর যুগেই পূর্ণ হওয়া আরম্ভ হয় আর আল্লাহ্ তাআলা সেই অঙ্গীকার এখনো পূর্ণ করে চলছেন। নবীদের বিরোধিতা হয়ে থাকে, তাঁরও হয়েছে এবং হচ্ছে। আহমদীয়া জামা'তের বিরোধিতা হচ্ছে। কিন্তু খোদা তাআলা তাঁর মর্যাদাকে সেই সময়ও সমুন্নত রেখেছেন যখন তিনি দাবী করেছেন এবং এখনো করছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

يا أحمد فاضت الرحمة على شفتيك إنك
بأعيننا يرفع الله ذكرك ويُتم نعمته
عليك في الدنيا والآخرة

(ইয়া আহমাদু ফাযাতির্ রাহ্মাতু আলা শাফাতাইকা ইন্নাকা বিআ'য়ুনিনা ইয়ার ফাউল্লাহু যিকরাকা ওয়া ইউতিম্মু নি'মাতাহু আলাইকা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে)

[রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত তাযকিরাহ্, পৃঃ ৫৪১-৫৪২, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪]

অর্থাৎ হে আহমদ! তোমার ওষ্ঠাধর থেকে কল্যাণধারা উৎসারিত হচ্ছে। তুমি আমার চোখের সামনে আছ। খোদা তোমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি করবেন। ইহ ও পরকালে তিনি তাঁর নিয়ামতকে তোমার জন্য পরিপূর্ণ করবেন।

তারপর আরেকটি ইলহাম হল:

حماك الله، نصرك الله، رفع الله حجة الإسلام. جمالٌ، هو الذي أمشاكم في كل حال. لا تُحاط أسرار الأولياء

(হামাকাল্লাহু নাসারাকাল্লাহু রাফাআল্লাহু হুজ্জাতাল ইসলামে জামালুন হুওয়াল্লাযি আমশাআকুম ফি কুলে হাল, লা তুহাতু ইসরারুল আওলিয়ায়ে) [প্রাগুক্ত, পৃ:৭৪]

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সহায়তা করবেন। আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ ইসলামের সত্যতার প্রমাণকে সমুন্নত করবেন। জামালে ইলাহী (অর্থ্যাৎ ঐশী সৌন্দর্য্য) যা সকল অবস্থায় তোমাকে পূত-পবিত্র করেছে। খোদার ওলীদের সাথে তাঁর সম্পর্কের যে রহস্য আছে তা আয়ত্তের বাইরে। কেউ এক রাস্তায় তাঁর দিকে আকর্ষিত হয় এবং কেউ অন্য কোন রাস্তায় ।

অতএব আজ খোদা তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে এবং আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে হলে এবং তাঁর সৌন্দর্য্য অবলোকন করতে হলে মহানবী (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রেমিক ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হলেই তা সম্ভব। খোদা তাআলার প্রতি মিথ্যারোপ করে কেউ কি নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে? খোদা তাআলার প্রতি মিথ্যারোপকারীকে আজ পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু এমনটি হয়নি। সেই খোদা যিনি নিজ বান্দার প্রতি বাণী অবতীর্ণ করেন, এটি তাঁর এক সত্য ও প্রেরিতের বাণী যাঁর সাথে তিনি বাক্যালাপ করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। তাই প্রতিনিয়ত আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মর্যাদা ভিন্ন মহিমায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখতে পাই।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সাথে এই অঙ্গীকারও করেছিলেন,

وضَعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

(ওয়াযা'না আনকা বিযরাকালাযি আনকাযা যাহরাকা ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাকা) [প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪]

অর্থাৎ আমরা তোমার সেই বোঝা লাঘব করেছি যা তোমার কটিদেশ ভেঙ্গে দিচ্ছিল এবং আমরা তোমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি করেছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, মহামহীম খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আজ এ ইলহাম হয়েছে

يا عبد الرافع إني رافعك إلي إني مُعزُّك لا مانع لما أعطي

(ইয়া আব্দার রাফে'য় ইন্নি রাফিউকা ইলাইয়্যা ইন্নি মুইয্যুকা লা মানেয়া লেমা উ'তি) [প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭]

অর্থাৎ হে উচ্চ মর্যাদা প্রদানকারী খোদার বান্দা! আমি তোমাকে আমার পক্ষ হতে উচ্চ মর্যাদা দান করবো। আমি তোমাকে সম্মান ও বিজয় দান করবো আর আমি যা কিছু দিব তা কেউ রুখতে পারবে না।

অতএব আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যে আশিস দান করেছেন এবং যা তাঁর জামাতের জন্যও প্রবহমান রয়েছে তা কোন জাগতিক শক্তি বন্ধ করতে পারবে না।

আর একটি ইলহাম হলো:

إني معك يا إمامٌ رفيع القدر

(ইন্নি মাআকা ইয়া ইমামু রাফিউল ক্বাদরে) [প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩০]

অর্থাৎ হে মহা মর্যাদাশালী ইমাম! আমি তোমার সাথে আছি।

এ কয়েকটি ইলহাম বর্ণনা করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য হলো, ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে যেখানে শান্তনা দিয়েছেন সেখানে তিনি তাঁর সমর্থনে জমিনী ও আসমানী নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। তাঁর জামাতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন, সে এ কথার সাক্ষী যে, খোদা তাআলা তাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদাকে চেনার শক্তি দান করেছেন। আর যে সুস্থ্য মনোভাব রাখে এবং প্রকৃতির, আল্লাহ্ তাআলা তার হেদায়াতের ব্যবস্থা করে থাকেন।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমর্থনে এবং তাঁর পদমর্যাদাকে সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে অগণিত নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন যা বলে শেষ করা যাবে না। এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় সেই কয়েকটি কথার উল্লেখ করবো যা তিনি তাঁর পুস্তক 'আনজামে আথমে' লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এসবকে তাঁর মোকাম, মর্যাদা এবং সম্মানের কারণ বলে অভিহিত করেছেন। 'আনজামে আথম' পুস্তকটি মূলত: তিনি আব্দুল্লাহ্ আথমের মৃত্যুতে লিখেছিলেন। আব্দুল্লাহ্ আথম সেই ব্যক্তি ছিল যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি শিক্ষনীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল আর আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও মাহাত্ম্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন।

আব্দুল্লাহ আথম ছিল একজন পাদ্রী। তার মৃত্যুতে কতিপয় আলেম এবং সাজ্জাদনশীন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এটিকে তাঁর সত্যতার কোন নিদর্শন বলে স্বীকার করেনি। এই প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদের সবাইকে

মোবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন আর আরবীতে একটি চিঠি লিখেন। চিঠি নয় বরং এটি ছিল দু'শতাধিক পৃষ্ঠার একটি পুর্ণাঙ্গ পুস্তক। এতে তিনি তাঁর স্বপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার সমর্থনাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ পুস্তকের শেষে তিনি (আ.) উর্দূতে একটি পরিশিষ্ট লিখেন। তাতে তিনি মৌলবী সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর একটি ভিত্তিহীন আপত্তি খন্ডন করেন যা মৌলবী আব্দুল হক গযনবী সম্পর্কে সে করেছিল। পরিশিষ্টের টীকায় তিনি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি সমর্থন এবং সম্মানজনক পদমর্যাদা প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে কিছু তুলে ধরছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে সকল বিষয় আয়াত **'আল্ আকবাতু লিলমুত্তাকীন' (খোদাভীরুদের পরিণামই শুভ হয়) অনুযায়ী আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে, স্মরণ থাকে যে সেগুলো নিম্নে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হল।'** তিনি বলেন, **'প্রথম কথা হল, আথমের বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আর সেই দিন ঐ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে যা বারাহীনে আহমদীয়াতে লেখা আছে। ইলহাম অনুসারে আথম মারা যায় আর এভাবে সব বিরোধীদের মুখ কালিমালিপ্ত হয়। তাদের সব মিথ্যা আনন্দ ধুলিস্যাৎ হয়। এই নিদর্শন পুর্ণ হবার সংবাদে শত শত হৃদয়ের অবিশ্বাস দূর হয়েছে আর হাজার হাজার চিঠি এর সত্যায়নে পৌঁছেছে এবং বিরোধীদের ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উপর সেই লাঞ্ছনা নিপতিত হয়েছে যার ফলে তাদের এখন মুখ খোলার আর অবকাশ নেই।'**

এরপর বলেন, **'সেই বিষয় যা মোবাহেলার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা আরবী পুস্তিকা সমূহের এই সমষ্টি যা বিরোধী মৌলবী ও পাদ্রীদের লাঞ্ছিত করার জন্য লেখা হয়েছে। আর তার একটি হলো এই আরবী পত্র যা এখন প্রকাশিত হলো। (যা তিনি আনজামে আথমে অন্তর্ভূক্ত করেছেন)। তার অন্য ভাই কি এই পুস্তিকাসমূহের ভয়ে মারা গেছে? কিছুই লিখতে পারলো না-(এটা আব্দুল হক সম্পর্কে বলা হচ্ছে) পৃথিবীবাসী এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আরবী জানার সম্মান এই ব্যক্তি অর্থ্যাৎ এই লেখকের জন্যই স্বীকৃত [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য] যাকে কাফির আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এই সব মৌলবীরা হল জাহেল বা অজ্ঞ।'**

তিনি বলেন, **'এই অধম আরবীর একটি সিগাও জানেনা বলে মোহাম্মদ হুসেইন বাটালভীর যে অপবাদ রয়েছে এখন খোদা তাআলা তাও অপসারণ করেছেন আর মোহাম্মদ হুসেইন ও অন্যান্য** বিরোধীদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন; সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার।'

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'তৃতীয় বিষয় যা আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা হলো – আমার সেই গ্রহণযোগ্যতা যা মোবাহেলার পর গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোবাহেলার পূর্বে আমার সাথে সম্ভবত তিন চারশ' লোক ছিল। কিন্তু এখন আট সহস্রাধিক এমন মানুষ রয়েছেন যারা এ পথে নিবেদিত আছেন। (এটা ১৮৯৩ এর কথা)। যেভাবে উৎকৃষ্ট জমিতে ফসল দ্রুততার সাথে বেড়ে উঠে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক সেভাবে এ জামাতের উন্নতিও অসাধারণভাবে সাধন হচ্ছে। পুণ্যাত্মারা এদিকে ছুটে আসছেন এবং খোদা তাআলা পৃথিবীকে আমাদের দিকে আকৃষ্ট করছেন।'** আল্লাহ্ তাআলার এই নিদর্শন আমরা আজ অবধি পূর্ণ হতে দেখছি যার কিছুটা আমি জলসার বক্তব্যেও উল্লেখ করেছিলাম।

তিনি (আ.) বলেন, **'মোবাহেলার পর এমন আশ্চর্যজনক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে যা দেখে এক গভীর ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। দু'একটি ইট থেকে আজ প্রাসাদে রূপ নিয়েছে, এক দু'ই ফোঁটা পানিকে এখন নহর মনে হয়** (আর দেখুন, আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপায় আজ এ নহরগুলো বড় বড় নদী বরং উত্তাল নদীর রূপ ধারণ করছে, সব ধরণের বিরোধিতা সত্ত্বেও মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতভূক্ত হচ্ছে)। তিনি (আ.) বলেছেন, **'ফিরিশ্তা কাজ করে চলেছে এবং হৃদয়ে জ্যোতি সঞ্চার করছে। সুতরাং দেখ! কত মহান সম্মান লাভ করেছি। সত্যি করে বল, এটা খোদা তাআলার কাজ, না-কি মানুষের?'**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন- **'যে বিষয়টি মোবাহেলার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তাহলো, একই রমযানে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ। হাদীস গ্রন্থে শতশত বছর ধরে লিখিতরূপে চলে আসছে যে,** *মাহদীর সত্যায়নের জন্য রমযানে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে।* **আজ পর্যন্ত এমন কোন মাহদীর দাবীদার অতিবাহিত হয়েছে বলে কেউ লিখেনি যার সম্মানে খোদা একই রমযানে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়েছেন। সুতরাং মোবাহেলার পর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।'**

তিনি (আ.) বলেন:- **'হে অন্ধরা! এখন ভেবে দেখ! মোবাহেলার পর এ সম্মান কে পেয়েছে? আব্দুল হক আমার লাঞ্ছনার মানসে দোয়া করত। কিন্তু এটা কি হলো, আকাশও আমাকে সম্মান দেয়ার জন্য ঝুঁকলো? তোমাদের মধ্যে কি একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিও নেই, যে এ বিয়ষটি নিয়ে ভাববে? তোমাদের মধ্যে**

কি একটি হৃদয়ও এমন নেই, যে এ বিষয়টি বুঝবে? পৃথিবীও সম্মান দিয়েছে আর একইসাথে আকাশেও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন, **'পঞ্চম বিষয় যা মোবাহেলার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা হলো, আমি যে কুরআনের জ্ঞান রাখি তার অকাট্য প্রমাণ। আমি এ জ্ঞান লাভ করেছি; আব্দুল হকের দল হোক বা (মোহাম্মদ হুসেইন) বাটালভীর সাঙ্গপাঙ্গ হোক বস্তুত সকলকে উচ্চস্বরে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যে, আমাকে কুর'আনের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম রহস্য শিখানো হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কারও এ সামর্থ্য নেই যে. আমার সামনে কুরআনের প্রকৃত ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের মোকাবেলা করতে পারে। সুতরাং এই ঘোষণার পর তাদের মধ্য থেকে কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেনি। বরং সকল লাঞ্ছনার মূল অর্থাৎ নিজেদের অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নিয়েছে।'**

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'সে সময় *কেরামাতুস্ সাদেকীন* নামক বইটি লেখা হয়। এই মু'জেযার বা নিদর্শনের বিপরীতে কোন ব্যক্তি একটি শব্দও লিখতে পারলো না।'** তিনি (আ.) আরও বলেন-**'এর মাধ্যমে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে, মোবাহেলার পর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সম্মান দান করেছেন?'**

তিনি (আ.) বলেন, 'ষষ্ঠ বিষয় যা মুবাহেলার পর আব্দুল হকের লাঞ্ছনা ও আমার সম্মানের কারণ হয়েছে তাহলো: **'আব্দুল হক মোবাহেলার পর একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে, তার ঘরে এক পুত্র সন্তান হবে এবং আমিও আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে *আনওয়ারুল ইসলাম* পুস্তকে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে পুত্র সন্তান দান করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও কৃপায় আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। যার নাম শরীফ আহমদ।'** এখানে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-এর জন্মের কথা বলা হয়েছে। **'এখন সে প্রায় পৌনে দুই বছরের। আব্দুল হককে এখন এটা জিজ্ঞেস করা উচিত, মোবাহালায় প্রদত্ত কল্যাণের প্রমাণ মূলক তার সেই সন্তান কোথায়?'** তিনি (আ.) বলেন **'এটা লাঞ্ছনা বৈ আর কী! সে যা বলেছে তার কিছুই পূর্ণ হয় নি এর বিপরীতে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে ইলহামের ভিত্তিতে আমি যা কিছু বলেছি খোদা তাআলা তা পূর্ণ করেছেন।'**

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'সপ্তম বিষয়টি যা মোবাহেলার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির ও গ্রহণযোগ্যতার কারণ হয়েছে তা, খোদা তাআলার সাধু প্রকৃতির বান্দাদের সেই নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ ও উদ্দীপনা যা তারা আমার সেবার জন্য প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার সেসব আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নিয়ামত এবং কল্যাণরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সামর্থ্য আমার কখনও হবে না যা মোবাহেলার পর আমি লাভ করেছি। আধ্যাত্মিক পুরস্কার সমূহের দৃষ্টান্ত আমি পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা নিদর্শনরূপে আমাকে কুরআনের জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞান দান করেছেন। এর বিপরীতে আব্দুল হক কেন, বরং সকল বিরুদ্ধবাদীই লাঞ্ছিত হয়েছে। প্রত্যেক সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি এটা জেনে গেছে যে, এরা শুধু নাম সর্বস্ব মৌলভী।'**

তিনি (আ.) বলেন- **'জাগতিক কল্যাণরাজী যা আমাকে মোবাহালার পর দান করা হয়েছে তা হলো সেই আর্থিক বিজয় সমূহ যা আল্লাহ্ তাআলা এ দরবেশ খানার জন্য অবারিত রেখেছেন। মোবাহেলার দিন থেকে এ পর্যন্ত অদৃশ্য হতে ১৫ হাজারের মত রুপী হস্তগত হয়েছে যা এই জামাতের কাজে ব্যয় হয়েছে।**

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'এমন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত ইবাদতকারী বান্দা আমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যারা নিজের ধন-সম্পদ এ কাজে খরচ করাকে সৌভাগ্য বলে মনে করেন।**

এরপর তিনি কয়েকজন নিষ্ঠাবানের নাম উল্লেখ করে বলেন, **'যারা হাজার হাজার রুপী ইসলাম তথা আহমদীয়াতের উন্নতির জন্য প্রদান করেছেন এবং মাসে-মাসেও দিয়ে যাচ্ছেন।'** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতে অর্থ, সংখ্যা এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করার ঐশী সাহায্যের নিদর্শন আজও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতিই আসল উন্নতি যা হওয়া উচিত।

তিনি (আ.) বলেন- **'অষ্টম বিষয় যা মোবাহেলার পর, আমার সম্মান বৃদ্ধির জন্য প্রকাশিত হয়েছে তাহলো 'সৎ বচন' পুস্তিকার রচনা। এ পুস্তিকা রচনার জন্য খোদা তাআলা আমাকে সেই উপকরণ প্রদান করেছেন যা তিনশত বছর থেকে কারও দৃষ্টি গোচর হয়নি।'** এটা চোলা বাবা নানক সম্পর্কে বলেছেন যা এতদিন থেকে সংরক্ষিত ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এটা প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে যে বাবা নানক মুসলমান ছিলেন। তিনি (আ.) বলেন **'এ পুস্তকে বাবা নানকের ব্যাপারে আমি প্রমাণ করেছি যে, বাবা সাহেব আসলে মুসলমান ছিলেন। আর তিনি *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্* যপ করতেন। তিনি খুবই পূণ্যবান লোক**

ছিলেন এবং তিনি দু-বার হজ্জও করেছেন।' এ চোলা বা জোব্বাকে এক সময় লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু এখন তা তার বংশধরদের কাছে সুরক্ষিত আছে। আমাদের জলসায় বেদী সাহেব নামে একজন শিখ অতিথিও এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, এটি তাদের পরিবারের কাছে সুরক্ষিত আছে।

তিনি (আ.) বলেন **'আরেকটি নিদর্শন হলো,'নবম বিষয় যা মোবাহালার পর আমার সম্মান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা হলো এ সময়ের ভেতর আট সহস্রাধিক মানুষ আমার হাতে বয়'আত করেছে। অনেকে কাদিয়ান এসে বয়'আত করেছেন এবং অনেকে চিঠির মাধ্যমে তওবা করেছেন। সুতরাং আমি নিশ্চিত জানি যে, আদম সন্তানের এত বড় একটি গোষ্ঠির তওবার মাধ্যম যে আমাকে করা হয়েছে তা সেই গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন যা খোদার সন্তুষ্টি লাভের পর অর্জিত হয়। আর আমি দেখছি আমার হাতে বয়'আতকারীদের মাঝে দিন দিন পুণ্য ও ত্বাকওয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে।'**

যেভাবে আমি বলেছি, পুণ্য ও ত্বাকওয়া-ই হচ্ছে সেই বিষয় যা জামাতের সদস্যদের মাঝে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। শুধুমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া যথেষ্ট নয়। কাজেই আহমদীদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টা করা আবশ্যক।

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'আমি অধিকাংশকে দেখি যে, তারা সেজদায় কাঁদে আর তাহাজ্জুদে আহাজারি করে। অপবিত্র হৃদয়ের লোক এদেরকে কাফির বলে কিন্তু এরা ইসলামের প্রাণ (জীবন শিরা)।'**

অতএব এ হলো সেই মাপকাঠি, যার ওপর আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আজও অনেকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং আমাদেরকে এই মানে অধিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করা উচিত।

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'এখন আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ভেবে দেখা উচিত, আব্দুল হকের সাথে মোবাহেলার পর এই বাগানের কত অসাধারণ উন্নতি ও সজীবতা অর্জিত হয়েছে! যার চোখ আছে সে দেখতে পারে যে, খোদা তাআলার মহিমাই এটা করেছে। অমৃতসরে আমাদের নিষ্ঠাবান জামাত রয়েছে, লাহোর, শিয়ালকোট এবং কপুরথলায় আমাদের নিষ্ঠাবান জামাত রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শহরে আমাদের নিষ্ঠাবান জামাত আছে আর তারা নিজেদের মাঝে সেই নিষ্ঠার জ্যোতি ও ভালবাসা রাখেন, যদি একবার কোন অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোক কোন জনসমাবেশে তাদের মুখ দেখে– তবে নিশ্চিত বুঝবে যে, খোদা তাআলার মু'জেযাই তাদের হৃদয়ে এই নিষ্ঠা সঞ্চার করেছে। তাদের চেহারায় ভালবাসার আলো ঝলমল করছে। এটি প্রথম জামা'ত যাদেরকে খোদা তাআলা সত্যতা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন।'**

এ পর্যায়ে আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে– এসব স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এই শহরগুলো এবং ভারতবর্ষের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকদের বলছি, আপনারা আপনাদের পিতৃপুরুষের সেসব আন্তরিকতা ও ত্যাগের কথা সর্বদা স্মরণ রাখুন এবং এতে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকুন কেননা এটি এমনই যা জামাতের উন্নতির কারণ হবে এবং আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সত্যিকারভাবে সম্পৃক্ত করে সেসব কল্যাণের ভাগী করবে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দিয়েছেন। আজ ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য জামাতেও এই আন্তরিকতা সৃষ্টি হচ্ছে; হোক তা ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকা। সুতরাং প্রতিটি জামাতকে নিজেদের আধ্যাত্মিকতার মান উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত এবং উন্নতি অব্যাহত থাকা উচিত।

এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'দশম বিষয়টি হচ্ছে, মোবাহেলার পর যা আমার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা লাহোরের সর্ব-ধর্ম সম্মেলন। এ জলসা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। যে প্রকৃতির এবং যে ধরনের প্রাঞ্জল গ্রহণযোগ্যতা আমার প্রবন্ধ পাঠে প্রতিভাত হয়েছে এবং যেমন আন্তরিক আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে মানুষ আমাকে ও আমার প্রবন্ধকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে তা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে আপনারা অনেক সাক্ষ্য শুনেছেন। সর্বধর্ম সম্মেলনে এই প্রবন্ধটির এমন অসাধারণ প্রভাব পড়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন ফিরিশ্তারা আকাশ হতে নূরের পেয়ালা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রতিটি হৃদয় এর প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছে যেন কোন অদৃশ্য হাত তাদেরকে অবলীলায় মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে যখন মানুষ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একথা বলে উঠেছিল, আজ যদি এই প্রবন্ধ না হতো তবে মুহাম্মদ হুসেইন প্রমূখের কারণে ইসলামকে অপদস্ত হতে হতো। সবাই বলছিল, আজ ইসলামের বিজয় হয়েছে। এখন চিন্তা কর, এ বিজয় কি একজন দাজ্জালের প্রবন্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে?**

পুনরায় বলছি, একজন কাফিরের কথায় কি এই মাধুর্য, এ কল্যাণ ও প্রভাব সৃষ্টি করা হয়েছে? মোহাম্মদ হুসেইন বাটালভীর মতো যারা নিজেদের মু'মিন

বলে দাবী করেছিল এবং আট হাজার মুসলমানকে কাফির বলছিল, এ জলসায় খোদা তাআলা তাদেরকে কেন লাঞ্ছিত করলেন? এটা কি সেই ইলহামের পূর্ণতা নয় যে, যারা তোমার লাঞ্ছনা চাইবে আমি তাদেরকে লাঞ্ছিত করব। এই মহান জলসায় এমন ব্যক্তিকে কেন এত সম্মান দেয়া হলো, যিনি মৌলভীদের দৃষ্টিতে কাফির ও মুরতাদ। কোন মৌলভী কি এর উত্তর দিতে পারবে? প্রবন্ধের মাহাত্ম্যের কারণে প্রাপ্ত সম্মান ছাড়াও সেদিন সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে যা এই প্রবন্ধ সম্পর্কে পূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছিল অর্থাৎ *এই প্রবন্ধটি সকল প্রবন্ধের উপর বিজয়ী হবে* এবং এ বিজ্ঞাপনটি জলসার পূর্বেই সকল বিরুদ্ধবাদীর নিকট পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং এই দিন সেই ইলহামও পূর্ণ হয়েছে এবং লাহোর শহরে এই আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল যে, প্রবন্ধের মাধ্যমে কেবল ইসলামের বিজয়ই অর্জিত হয়নি বরং একটি ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে।’ হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) **‘ইসলামী নীতি দর্শন’** প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন।

তিনি (আ.) বলেন, **‘অতএব মোবাহেলার পর আমরা এ সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছি। এখন কোন মৌলভী আমাদের বুঝাক যে, মোবাহেলার পর আব্দুল হক পৃথিবীতে কোন্ সম্মানটা পেয়েছে? লোকদের মাঝে তার কোন্ গ্রহণযোগ্যতাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? আর্থিক উন্নতির কোন্ কোন্ দ্বার তার জন্য খুলেছে? জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের কোন্ মুকুট তাকে পরানো হয়েছে?’**

তিনি (আ.) বলেন, **‘আমি মোবাহেলার**

فعليهم أن يتدبروا ويفكروا في هذه العشرة الكاملة.

এ দশটি বরকত বা কল্যাণের কথা লিখেছি। কত দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা যারা এই মোবাহেলাকে অকার্যকর মনে করে!

(আনজামে আথম-রূহানী খাযায়েন-একাদশ খন্ড-পৃ:৩০৯-৩১১ এর পাদটীকা)

অতএব আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিদর্শন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সমর্থনে যেসব নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, মর্যাদা দান করেছেন এবং শত্রুরা যে কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে লিখেছেন,

وأما بنعمة ربك فحدّث

‘কুরআন করীমের আয়াত অনুযায়ী আমি নিজ সম্পর্কে বলছি, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে সেই নিয়ামত দান করেছেন যা আমার নিজ প্রচেষ্টায় নয় বরং মাতৃগর্ভেই আমাকে দান করা হয়েছিল। আমার সমর্থনে তিনি যতগুলো নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, আমি যদি সেগুলোকে এক একটি করে গণনা করি তবে আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি, তা তিন লাখের অধিক হবে।’ (এটি ১৯০৬ সালের কথা)। **‘কেউ যদি আমার কসম খাওয়াকে বিশ্বাস করতে না পারে, আমি তাকে প্রমাণ দিতে পারি। কতক নিদর্শন এমন যা সকল পর্যায়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার সাথে সম্পর্ক রাখে। কতক নিদর্শন এমন, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে আমার অভাব দূর হওয়া ও চাহিদা পূর্ণ হওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং কতক নিদর্শন এমন রয়েছে, যা**

إني مهين من أراد إهانتك

মোতাবেক তিনি তাঁর এ প্রতিশ্রুতি:

(ইন্নি মুহীনুন মান আরাদা ইহানাতাকা- অর্থাৎ যারা তোমাকে লাঞ্ছিত করতে চাইবে আমি তাদের লাঞ্ছত করব) **অনুযায়ী আমার উপর আক্রমণকারীকে লাঞ্ছিত করেছেন।’**

আজও আমরা এমন দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করছি। অনেক স্থানে তা দেখা যায়। এই ইলহামের পরিপূর্ণতার অনেক ঘটনা রয়েছে আর বিভিন্ন দেশে তা ঘটছে।

তিনি (আ.) বলেন, **‘কতক নিদর্শন এমন রয়েছে, যা মোতাবেক তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে বিজয় দান করেছেন। কিছু নিদর্শন আমার প্রত্যাদিষ্ট জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। কেননা পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি কোন মিথ্যাবাদীকে এমন সুদীর্ঘ আয়ুস্কাল দেয়া হয়নি। কিছু কিছু নিদর্শন যুগের অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়।’**

একই অবস্থা আজও বিরাজ করছে এবং সেই অবস্থা ইমামের আবশ্যকতার প্রতি

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ইঙ্গিত করছে। সর্বত্র আমরা

এর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে মুসলমান দেশগুলোতে এ অশান্তি সব চাইতে বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

তিনি (আ.) বলেন, **‘কতক নিদর্শন যুগের অবস্থার সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ চলমান যুগ কোন ইমামের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বন্ধুদের পক্ষে আমার দোয়া গৃহীত হওয়ার কতক নিদর্শন রয়েছে আর দুষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে আমার দোয়ার কার্যকারীতা প্রকাশ পেয়েছে। কতিপয় গুরুতর অসুস্থ্য ব্যক্তি আমার দোয়ায় আরোগ্য লাভের কতক**

নিদর্শন রয়েছে আর তাদের আরোগ্য লাভের পূর্বেই আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে। কোন কোন নিদর্শন এমন যে, আমার সত্যায়নের জন্য বড় বড় মর্যাদাশালী ব্যক্তিরা স্বপ্ন দেখেছেন যারা প্রখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন এবং তারা মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন হলেন, সিন্ধুর সাহেবুল আলম পীর খাজা গোলাম ফরিদ চাচড়াওয়ালা– যার প্রায় এক লাখ মুরিদ ছিল। কতক নিদর্শন এমন রয়েছে যে মোতাবেক হাজার হাজার মানুষকে স্বপ্নে বলা হয়েছে, *এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত;* তারা কেবল এ কারণে আমার হাতে বয়'আত করেছেন (আজও আমরা এ দৃশ্য দেখছি)। কেউ কেউ এ কারণে বয়'আত করেছেন যে, মহানবী (সা.)-কে তারা স্বপ্নে দেখেছেন এবং তিনি (সা.) বলেছেন, পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, এ ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার শেষ খলীফা ও মসীহ্ মাওউদ। কিছু কিছু এমন নিদর্শনও রয়েছে যে, কতক অভিজাত ব্যক্তিবর্গ আমার আগমনের পূর্বেই আমার নাম নিয়ে আমার মসীহ্ মাওউদ হবার সংবাদ দিয়েছেন। যেমন নিয়ামতুল্লাহ্ ওলী ও লুধিয়ানার জামালপুর নিবাসী মিয়া গোলাব শাহ্।' (হাকীকাতুল ওহী-রূহানী খাযায়েন-২২তম খন্ড-পৃ:৭০-৭১)

অতঃপর তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, **'যখন আমি ১৯০৪ সালে করম দ্বীনের ফৌজদারী মামলার জন্য ঝিলাম যাচ্ছিলাম পথিমধ্যে আমার ওপর ইলহাম হল أُرِيكَ بركات من كل طرف** *উরিকা বারাকাতিন মিন কুলি তারাফিন* **অর্থাৎ সকল দিক থেকে তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করবো। তখনই জামাতের সবাইকে এ ইলহাম শুনিয়ে দেয়া হয়েছে বরং আল্ হাকাম পত্রিকায় তা প্রকাশও করা হয়েছে। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এভাবে পূর্ণ হল যে, যখন আমি ঝিলামের নিকট পৌঁছলাম তখন প্রায় দশ সহস্রাধিক মানুষ আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসল। গোটা রাস্তা ছিল লোকে লোকারণ্য। তারা এমন বিনীত অবস্থায় মিলিত হয় যেন সিজদা করছিল। এছাড়াও জেলা আদালতের চতুস্পার্শ্বে মানুষের এমন ভীড় ছিল যে, প্রশাসন অবাক হয়ে গেল। এগারশত পুরুষ এবং দুইশত মহিলা বয়'আত করে এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত হল। করমদীন আমার বিরুদ্ধে যে মামলা করেছিল তা খারিজ করে দেয়া হল। আর অনেক লোক ভালবাসা ও বিনয়ের সাথে নযরানা এবং উপঢৌকন পেশ করল। এভাবে আমি সকল দিক থেকে কল্যাণমন্ডিত হয়ে কাদিয়ানে ফিরে আসলাম। খোদা তাআলা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করলেন।'**

বারাহীনে আহমদীয়াতে অপর একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে,

(সুবহানাল্লাহে তাবারাকা ওয়া তায়ালা

سبحان الله تبارك وتعالى، زاد مجدك. يَنقطع آباؤُك ويُبدأ منك

যাদা মাজদাকা ইয়ানকাতাউ আবাউকা ওয়া ইউবদাও মিনকা) {বারাহীনে আহমদীয়া-পৃ:৪৯০} অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সকল প্রকার ক্রটি হতে মুক্ত এবং অতীব কল্যাণের অধিকারী। তিনি তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তোমার পিতৃপুরুষের নাম-ডাক মুছে ফেলা হবে এবং আল্লাহ্ তাআলা তোমার মাধ্যমে এ বংশের সম্মানের ভিত্তি রাখবেন।

'এটা সে সময়কার ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমাকে কোনভাবেই মর্যাদাবান মনে করা হত না। আমি এতটা অপরিচিত ছিলাম যেন পৃথিবীতে আমার কোন অস্তিত্বই নেই। এ ভবিষ্যদ্বাণী করার পর এ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন ভাবা উচিত, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি কত স্পষ্টরূপে পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে হাজার হাজার লোক আমার জামাতভূক্ত রয়েছে, ইতোপূর্বে কে জানত যে, পৃথিবীতে আমি এতটা সম্মান লাভ করবো? সুতরাং তাদের জন্য পরিতাপ! যারা আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না। এরপর এ ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বংশধরের প্রতিশ্রুতি ছিল তারও ভিত্তি রাখা হয়েছে। কেননা এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর চারজন পুত্র সন্তান, এক পৌত্র এবং দু'জন কন্যা সন্তান আমার ঘরে জন্ম নিয়েছে যারা তখন ছিল না।' (হাকীকাতুল ওহী-রূহানী খাযায়েন-২২তম খন্ড-পৃ:২৬৩-২৬৫)

আজ যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঔরসজাত সন্তান পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন সেভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানও পৃথিবীময় বিস্তৃত আছেন আর প্রতিদিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন প্রত্যেক দেশে সকল জাতিতে আমরা নিত্য নতুন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি এবং মির্যা গোলাম আহমদের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে চলেছেন সেই আল্লাহ্ তাআলা যিনি সর্বদা সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং প্রতিটি স্থানে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দশন দেখিয়েছেন। তিনি যাকে চান মর্যাদা দান করেন। তিনি বলেছেন, তিনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার আজ পর্যন্ত পূর্ণ করে চলেছেন। তাঁর এ প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই পূর্ণ হবে যে, তিনি তাঁর

মান্যকারীদের কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপর জয়যুক্ত করবেন।

অতএব সেই বিজয়ের অংশীদার হবার লক্ষ্যে প্রত্যেক আহমদীকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সকল দাবীর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতঃ এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে চেষ্টা করা উচিত এবং এ দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদেরকে সর্বদা এর সাথে সম্পৃক্ত রাখেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর (আ.) সাথে যেসব নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলো হতে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে বিনত থাকা প্রয়োজন।

আহমদীয়াতের বিরোধীরা বিভিন্ন সময় তাদের হৃদয়ের হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ করতে থাকে। সাধারণত পাকিস্তানের অবস্থাতো এমন যে, কোন মৌলভীর দৃষ্টিতে কেউ অপছন্দনীয় হলেই তাকে আল্লাহ ও রাসূলের অবমাননার নামে ধরিয়ে দেয়, বিষোদগার করে, এভাবে অন্যায় বশতঃ ইসলাম ধর্মকে দুর্নাম করতে থাকে। পরিণামে আজ সারা পৃথিবীতে দেশটির দূর্নাম ছড়িয়ে পড়েছে। তারা আহমদীদের উপর অত্যাচার করে, তাদের ইবাদতের পথে বাঁধা সৃষ্টি করছে, তাদের কলেমা পাঠে বাঁধা দেয়। এরা আহমদীদের কলেমাও কেড়ে নিতে পারেনি আর ইবাদত থেকে বিরতও রাখতে পারেনি কিন্তু তাদের নিজেদের অবস্থা এমন যে, অন্তঃকলহ ও ফিৎনা-ফাসাদের কারণে তাদের মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারের নির্দেশে তাদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়, সেখান থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হয়।

এ হলো সার্বিক অবস্থা– কিন্তু সেখানে ইসলামের নামে নির্যাতন এতটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, কিছুদিন পূর্বে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানদের উপর বর্বরতার নৃশংস দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। মোল্লা ইসলামের নামে, যে কোন কাজকে ইসলাম পরিপন্থী ঘোষণা দিয়ে যাকে খুশী তার উপর নির্যাতন শুরু করিয়ে দেয়। দেশে কোন আইন নেই আর এটাই দেশের সার্বিক চিত্র। আইনহীনতার রাজত্ব চলছে। আইনের শাসন চলবে বলে তারা স্লোগান দেয় আর বলে যে, বিচার বিভাগ পুনর্বহাল হয়ে গেছে এবং অমুকটা হয়ে গেছে তমুকটা হয়ে গেছে কিন্তু কার্যতঃ আইনের শাসন এ কথাটি কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। যখন কোন গরীব নাগরিকের অধিকার আদায়ের প্রশ্ন আসে তখন তাদের এসব আইন উধাও হয়ে যায়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীদের, বিশেষ করে পাকিস্তানী আহমদীদের স্বদেশের জন্য দোয়া করা আবশ্যক। আমি পূর্বেও বলেছি, ১৯৭৪ সালে এবং পুনরায় ১৯৮৪ সালে যখন তারা এ আইনটি পাশ করেছে এরপর থেকে পাকিস্তানে বিশেষ করে আহমদীদের ওপর চরম অত্যাচার হয় এবং হচ্ছে। যে কেউ তাদের নিজেদের মনগড়া ইসলামের নামে যাকে ইচ্ছে নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করছে। আইন এবং রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখতে মৌলবীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে এবং মৌলবীদের ভয়ে এমন কেউ নেই যে, সুবিচার করতে পারে।

বিশেষ করে পাকিস্তানী আহমদীদের স্বদেশের জন্য দোয়া করা আবশ্যক। আমি পূর্বেও বলেছি, ১৯৭৪ সালে এবং পুনরায় ১৯৮৪ সালে যখন তারা এ আইনটি পাশ করেছে এরপর থেকে পাকিস্তানে বিশেষ করে আহমদীদের ওপর চরম অত্যাচার হয় এবং হচ্ছে। যে কেউ তাদের নিজেদের মনগড়া ইসলামের নামে যাকে ইচ্ছে নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করছে। আইন এবং রাজনীতিবিদরা নিজেদের স্বার্থের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখতে মৌলবীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে এবং মৌলবীদের ভয়ে এমন কেউ নেই যে, সুবিচার করতে পারে।

অতএব আহমদীরা এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়া করুন কেননা পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হচ্ছে। বিশেষ করে পাকিস্তানী আহমদীরা, আপনারা আল্লাহ্ তাআলার দরবারে বিনয়াবনত হোন, তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করুন, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যেই কাজ করুন, বেশি বেশি সদকা করুন। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে; তাই আহমদীয়া জামাত উন্নতি করবেই ইন্‌শাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এ দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তাআলা যেন সকল আহমদীকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের জামাতকে তাঁর বিশেষ নিরাপত্তায় রাখেন।

যুক্তরাজ্যে জলসা হয়েছে, জলসার পর থেকে আরবের কোন কোন দেশেও সেখানকার সরকার আহমদীদের বিরক্ত করা আরম্ভ করেছে। তারা ক্ষেপে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর মানুষকে বোধ-বুদ্ধি দিন যাতে তারা বিরোধিতার পরিবর্তে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর

দাবীকে মেনে নেয়। আর মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর সালাম পৌঁছে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে ঈমানী দৃঢ়তা দান করুন।

আজও একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। মুলতানে মোকাররম রানা আতাউল করীম নূন সাহেব নামে আমাদের একজন যুবক ছিলেন। গতকাল তিনজন অস্ত্রধারী ঘরে ঢুকে তাকে শহীদ করেছে,

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। তিনি একজন ওসিয়্যতকারী ছিলেন। জামা'তের সাথে গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। কিছু দিন থেকে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল কেননা কতিপয় সন্দেহভাজন তার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। এ জন্য রাতের বেলা দু'ভাই পালাক্রমে বাড়ী পাহারা দিতেন।

শাহাদাতের ঘটনা যেভাবে ঘটে তা হলো, তিনি দশ পনের মিনিটের জন্য বাড়ী থেকে বের হয়ে কোন ধোপার দোকানে গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েক মিনিট সময় লেগেছে। বাইরের বৈঠকখানার দরজাটা ভুলে খুলে রেখে চলে গিয়েছিলেন আর এ সুযোগে সেই অস্ত্রধারী তিন যুবক ঘরে ঢুকে পড়ে এবং বাড়ির লোকদের গৃহবন্দী করে সেখানেই লুকিয়ে থাকে। ঘরে ঢোকা মাত্র তাঁকে (মররহুমকে) গুলি করে। তাঁর শরীরে তিনটি গুলি বিদ্ধ হয় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি শিক্ষিত ছিলেন, ব্যবসা করতেন, কৃষিতে এম.এস-সি. পাশ করেছেন। তিনি পিতামাতা, স্ত্রী ছাড়াও দু'টি কন্যা সন্তান এবং তিন বোন ও চার ভাই রেখে গেছেন।

এখন আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো এবং একটি জানাযা হাযেরও রয়েছে যা চৌধুরী এনায়েতুল্লাহ্ সাহেবের জানাযা। তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইন্সপেক্টর ছিলেন। ৪ঠা আগষ্ট ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন এবং পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল ধরে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, সিলসিলার প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি খিলাফতের সাথে পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। তার এক ছেলে হাবিবুল্লাহ্ তারেক জার্মানির সেক্রেটারী সানাত ও তিযারাত। আরেক ছেলে আমাদের মুবাল্লেগ, বর্তমানে ফিজির আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ– ফজলুল্লাহ্ তারেক সাহেব। মরহুম এখানকার আনসারুল্লাহ্র নায়েব সদর আব্দুর রশিদ সাহেবের শ্বশুর ছিলেন। তার মৃতদেহ এখানে আনা হয়েছে। এরসাথে এই জানাযাও পড়াবো।

> ***আজ যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঔরসজাত সন্তান পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন সেভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানও পৃথিবীময় বিস্তৃত আছেন আর প্রতিদিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন প্রত্যেক দেশে সকল জাতিতে আমরা নিত্য নতুন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছি এবং মির্যা গোলাম আহমদের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে চলেছেন সেই আল্লাহ্ তাআলা যিনি সর্বদা সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং প্রতিটি স্থানে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দশন দেখিয়েছেন। তিনি যাকে চান মর্যাদা দান করেন। তিনি বলেছেন, তিনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না।***

এ ছাড়াও পূর্বেই হয়তো ঘোষণা হয়ে থাকবে যে, আরো কয়েকটি জানাযা গায়েব রয়েছে যেগুলো একইসাথে আদায় করা হবে। একটি আমেরিকার লসএঞ্জেলসের অধিবাসী মোকাররম মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের জানাযা, অন্যটি চৌধুরী খাদেম হোসেন আসাদ সাহেবের। ইনি সিন্ধুর নাসেরাবাদে ম্যানেজার ছিলেন, সিন্ধু প্রদেশের কুনরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি এখানকার ডা: তারেক বাজওয়া সাহেবের পিতা ছিলেন। সিরিয়া নিবাসী মোকাররম লোয়ী নাহাবী সাহেব, সাজ্জাদ আহমদ সাহেব মুরব্বী, রাবওয়াতেই তাকে কেউ হত্যা করেছে, লাহোরের অধিবাসী আমাতুল বাসীর মেহরীন সাহেবা এবং রেহানা হামিদ সাহেবা। জানাযায়ে হাযেরের সাথে তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়ানো হবে। আল্লাহ্ তাআলা সকল মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। তাদের পরিবারকে ধৈর্য্য ধারণের শক্তি প্রদান করুন। (আমীন)

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ এবং কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের যৌথ উদ্যোগে অনূদিত)

নেযামে নও

(নব বিশ্বব্যবস্থা)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ রাযিআল্লাহু আনহু
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা

(৫ম কিস্তি)

কমিউনিজমের ৬ষ্ঠ ত্রুটি অর্থাৎ জাতিগত পার্থক্য

৬ষ্ঠ ত্রুটি হলো এ বিপ্লবের ফলে মানবজাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে আর এতে ধনী ও বিত্তবানদের হত্যা করা শুরু হয়ে যাবে। বিশ্ব জুড়ে জাতিগত দাঙ্গা বিস্তার লাভ করবে।

কমিউনিজমের ৭ম ত্রুটি

বলশেভিক বিপ্লবের ৭ম নীতিতে আরো এক বড় বিভ্রান্তি রয়েছে। প্রচলিত হলো–এক বাদশা মৃত্যু বরন করলে তদস্থলে অপর এক বাদশা শাসন কার্য পরিচালনার জন্য মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আবার এক পার্লামেন্ট ভেঙ্গে গেলে অপর এক পার্লামেন্ট গঠিত হয়। কিন্তু বলশেভিক আন্দোলনে কখনও দুর্বলতা ভর করলে তা একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। তাহলে তো সেই স্থলে আবারো **'জার'-ই** ক্ষমতায় আসবে, অপর কোন শাসক আসবে না। কেননা বলশেভিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিনিধিত্বশীল অন্য কোন পদ্ধতি নেই যা তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। বাস্তব অবস্থা এই যে, বিচক্ষণতা নি:শেষ করে দেয়া হয়েছে। আর বিচক্ষণতা লোপ করতে গিয়ে মেধাকে যখন অবমূল্যায়ন করা হয় তার ফল এটাই হয়ে থাকে যে, সমস্যার সংকটে যখন পতিত হয় সে সময়ে এমন কোন বুদ্ধিমানের সন্ধান পাওয়া যায় না, যে এই সংকটাবস্থা দূর করতে সক্ষম। অতএব এই বিপ্লব যখন নিম্নগামী হবে তখন তা সম্পূর্ণরূপেই ধরাশায়ী হবে। যেমনটি ফ্রান্সে হয়েছে। ফ্রান্সে যখন বিদ্রোহের সংকট সৃষ্টি হয় তখন নেপোলিয়নের ন্যায় সুসংগঠক ও বিচক্ষণ এক যোদ্ধা সে দেশের কর্তৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়। সাধারণ জনগণ থেকে উত্থিত গণতন্ত্র পরায়ণ কোন ব্যক্তি সেই অবস্থান গ্রহনে সক্ষম হয়নি।

জাতীয় সমাজবাদ আর এর অপূর্ণতাসমূহ

৩য় বিপ্লব যা **জাতীয় সমাজবাদ** নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল গরীবদের কিছু অধিকার অবশ্যই দেয়া হোক তবে ব্যক্তি মালিকানাকে যেন হরণ করা না হয়। আর যেহেতু এই আন্দোলনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারীদেরকে সম্ভ্রান্ত জ্ঞান করা হয় এজন্য তাদের নীতি হল– জার্মান, ইতালি ও স্পেনে বসবাসকারী গরীবদেরকে উত্তেজিত করে অন্যান্য জাতিকে নিষ্পেষণ করে তাদের ধন সম্পদ দ্বারা জার্মান, ইতালি ও স্পেনের বাসিন্দাদের সম্পদশালী করে দেয়া। এই বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্বে জাপানও শেষ পর্যন্ত এসে যোগ দিল।

এই আন্দোলনে বিদ্যমান নীতিগত ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ–

প্রথম ত্রুটি: প্রথম কথা হলো এই আন্দোলনে গুটি কয়েক দেশের উন্নয়নের অধিকার ব্যক্ত হয়েছে বটে তবে সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের কথা এতে নেই।

২য় ত্রুটি:-এই আন্দোলনের ২য় ত্রুটি হলো আত্মিক সুখ শান্তির দিক-নির্দেশ এতে নেই। অর্থাৎ ধর্মপালন সম্পর্কিত কোন পথ নিদের্শনা এতে রাখা হয়নি। বরং এই আন্দোলনও ধর্মের প্রতি কয়েক প্রকারের বিধি নিষেধ আরোপ করে থাকে। তাদের মতে 'ধর্ম' সেইটা আবার কী যার প্রতি মানুষের পক্ষ থেকে বিধি নিষেধ আরোপ করা যায়। ধর্ম যদি খোদার পক্ষ থেকেই প্রেরীত হয়ে থাকে তবে সেজন্য তাঁকে ধর্মের সংরক্ষণকারীকে দাঁড় করাতে হয় কেন?

তৃতীয় ত্রুটি:-

এই আন্দোলনের ৩য় ত্রুটি হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে এত বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে যে দেশবাসীর সম্মিলিত মতামতের উপর একে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যেখানে কিনা হাজার বার এমনটি ঘটতে পারে যে, এক ব্যক্তির মেধা ও বুদ্ধি বিবেচনা যত প্রখরই হোক না কেন যে কথা তার মনে উদিত হয় তা থেকে অপর ব্যক্তির মতামত যার মেধা ততটা উন্নত নয় তবুও সেই ব্যক্তির মতামতই প্রজ্ঞাপূর্ণ হতে পারে। এ জন্যই আমাদের ইসলামী শরীয়তে এটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একজন খলীফা থাকবেন, যিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলমানদের পরামর্শ নিবেন, আর যতটা সম্ভব তাদের প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করবেন। হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হলে যাতে তিনি মনে করবেন যে, এখন এ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের

মতামতকে যদি আমি গ্রহণ করে নিই তবে দেশ ও জাতির ক্ষতি সাধন হবে সেক্ষেত্রে তিনি তাদের পরামর্শের বাইরেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অবস্থাদৃষ্টে ইসলামের পদ্ধতি অনুযায়ী স্থান কাল ভেদে দু'টি পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এক দিকে সাধারণের মতামতকে গ্রহণ করা হয় আবার অপরদিকে যারা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তাদেরকে যদিও বলা হয়ে থাকে যে, তারা বুদ্ধি বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করুন তবুও তাদের প্রদত্ত যে পরামর্শ দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর তা তিনি গ্রহণ না করে ভিন্ন পরামর্শকেই গ্রহণ করে নেন। কিন্তু জাতীয় সমাজবাদী নীতিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের মানের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যখন কিনা কখনও কখনও এমনও হয়ে থাকে যে, পুরা গ্রামবাসী ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে আর এক প্রবীন কৃষক সঠিক কথা বলছেন, আবার কখনও ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি ভ্রান্তিতে নিপতিত থাকেন আর যুবকেরাই সঠিক কথাটি বলে থাকে। বস্তুত এরা সবাই ভুল ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে।

চলমান যুদ্ধ আর এর পরিণতি

চলমান যুদ্ধ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) এই সব দ্বন্দ্ব বিগ্রহের ফল। রাশিয়াবাসী চায় যে আমাদের দর্শন প্রতিষ্ঠিত হোক এবং সেই অবস্থা যার সূচনা রাশিয়ায় ঘটেছে তা বিশ্বের অবশিষ্ট দেশগুলোতেও সৃষ্টি হোক এবং ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও আমেরীকার সমাজ বাদীরা বলে যে, আমরা যে সম্পদ আহরণ করেছি তা আমাদের হাতেই থাকুক জার্মান, ইতালি, জাপান এবং স্পেনীয়দের হাতে চলে না যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাজবাদী ও জাতীয়তাবাদী সমাজন্ত্রীদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। সমাজবাদীরা এই জন্য যুদ্ধ করেছে যে, তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতায় কোন ঘাটতি যেন না পড়ে অপর দিকে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীরা এই জন্য আক্রমণ করেছে যে, আর্থিকভাবে অবস্থাসম্পন্ন লোকদের ধন সম্পদ কেড়ে নিজেদের দেশে নিয়ে আসবে। ৩য় আন্দোলন ছিল বলশেভিজমের। জার্মানিরা সাবধানতার সাথে এই সুযোগে রাশিয়ার সাথে সমঝোতা করে নেয় এবং তাদেরকে এই ধোঁকা দেয় যে বড় বড় শক্তিধর রাষ্ট্রে আগ্রাসী আক্রমণ করা হলে বলশেভিকরাও লুণ্ঠিত ঐ সম্পদের ভাগ পাবে। বলশেভিকরা এই ধোঁকায় পরে গেল এবং তারা জাতীয় সমাজবাদীদের সাথে সমঝোতা করে নিল। কিন্তু ফ্রান্সের রাষ্ট্র ক্ষমতা ভেঙ্গে যাওয়ার পর এদিকে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। যুদ্ধের অপরিহার্য কারণে তখন হিটলার ভিন্ন কিছু আন্দাজ করে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ইংল্যান্ডের ওপর অতর্কিত হামলা করা থেকে বিরত থাকে। আবার সৈন্যরা যদি অলস বসে থাকে তবে তারা ঘাবড়িয়ে যাবে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বি কেউই যখন নেই তাহলে লাগোয়া প্রতিবেশীকে আক্রমণ করে বলশেভিজমেরই সমাপ্তি ঘটানো যাক, তারা রাশিয়ার ওপর আক্রমণ চালালো। পরিণতি এই দাড়ালো যে বলশেভিজম পন্থীরা মিত্রশক্তি রাষ্ট্রগুলোর সাথে যোগ দিলো আর এভাবে দু'টি আন্দোলন একত্রিত হয়ে এক পক্ষে রূপ নিল আর অপর একটি আন্দোলন এক দিকে একা রয়ে গেল। জাতীয় সমাজবাদীরা জিতে গেলে জার্মান , ইতালী, স্পেন ও জাপানের গরীবদের তো অবশ্যই উপকার লাভ হয় কিন্তু বাকী জাতির গরীবদের হাল অবস্থা পূর্বের চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। ধরা যাক, চারটি দেশ থেকে দারীদ্র দূরীভূত হবে আর অগনিত দেশে পূর্বের চেয়েও বেশি দারীদ্রতা দেখা দিবে। আর অপর পক্ষ যুদ্ধে জয় লাভ করলে বিশ্বের কিছু অংশ সমাজতন্ত্রের প্রভাবে আর্থসামাজিক স্বাধিকার অর্জন করে ফেলবে, ভারত বর্ষেরও কিছু অধিকার লাভ হবে। কিন্তু ব্যবসা বানিজ্য ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন যদি উঠে, এর জন্য সেই সব দেশে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। কেননা এই স্বাধীনতা ও সমাধিকার লাভে প্রতিবন্ধক কেবল সংরক্ষণবাদী ও লিবারেল পার্টি থাকবে না বরং বিপ্লবীদের অবস্থান নিম্নগামী হওয়ার আশঙ্কায় সমাজবাদী দলভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে অন্যান্য দেশের যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকবে। কিন্তু যতদূর যুদ্ধ জয়ের প্রশ্ন অন্য দেশগুলোর অবস্থা নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশি ভাল থাকবে, জাতিয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীদের বিজয় লাভের পর যা ঘটতে পারে।

চলমান যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ে ভারতের লাভ

এই প্রসঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণ যা আমি পূর্বেও কয়েকবার বর্ণনা করেছি তা হলো জার্মানী জিতে গেলে আমাদের দেশের পরিস্থিতি আবারও অনেক খারাপ হয়ে যাবে আর ইংরেজরা জিতলে আমাদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে অবশ্যই ভাল হবে। সাধারণ ভাবে আমাদের দেশে ধারণা করা হয় পরাধীনই যদি রইলাম তবে গোলামী এর করি বা ওরই করি তাতে কী বা আসে যায় । এতদুভয়ের মধ্যে তফাত-ই বা কী? কিন্তু কথাটি সঠিক নয়। এর সমর্থনে এক প্রমাণ রয়েছে যা পূর্বেও কয়েকবার আমি বর্ণনা করেছি আর তা হলো, এই মিত্র শক্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান ধরে রাখার কারণে সেই শক্তিশালী অবস্থান ক্ষয়ীষ্ণু হয়ে পড়েছে যা অবশ্যই নব উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে দৃশ্যমান

হচ্ছে। অতএব নব উত্থিত জাতিগুলোর সম্পর্ক অন্যান্য দেশের লোকদের সাথে ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের ন্যায় হবে। আর এই শক্তিধর রাষ্ট্র (বৃটেন)- এর অবস্থা এক প্রবীণ বিত্তবান ব্যবসায়ীর মত হবে যে বহু টাকা কড়ি রোজগার করেছে। কৃপন তো এরাও হবে আর তারাও। সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা তাদেরও হবে, তবে তারা বিদ্যমান আর্থিক অবস্থানেই সন্তুষ্ট থাকবে। আবার কখনও কখনও তাদের মনে এই ধারণা উদিত হয়ে থাকবে যে, আমরা এখন যথেষ্ট-ই অর্থ উপার্জন করে নিয়েছি এখন আমি নিজ থেকে অবসর নিয়ে নিই। আবার শক্তিধর রাষ্ট্র যারা তাদের মাঝে এখন ততটা উদ্দীপনা নেই যা অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদীয়মান রাষ্টগুলোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। উদাহারণ স্বরূপ দেখ! কোথাকার ইংল্যান্ডের বাসীন্দা ইংরেজরা চীনের উপকণ্ঠ পর্যন্ত শাসন কার্য চালাচ্ছে। একই ভাবে আমেরিকার শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান সমগ্র বিশ্ব ছেয়ে আছে। তাদের পেট এতটাই ভরে আছে যে, তাদের জন্য এখন চলাফেরা করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। এতটা তৃপ্ত যারা তারা সাধারণত জুলুম করেনা বা করলেও কমই করে। এর উপমা তোমরা এভাবে বুঝে নাও, যে ব্যক্তির পেট ভরা থাকে তার সামনে পোলাও কোরমা রাখলেও সে দু'চার লোকমা নিয়েই ক্ষান্ত হবে কিন্তু সেই পোলাও কোরমার প্লেট ক্ষুধার্ত কারো সামনে রাখলে সে কেবল প্লেটের ঐ খাবার টুকুই খাবে না বরং তোমার জন্য রেখে দেয়া খাবারটুকুও সাবাড় করে ফেলবে। বর্তমানে জার্মান, ইতালি ও স্পেন ক্ষুধার্ত রয়েছে। এই জন্য তাদের পালা যদি এসে যায় তবে কিছুকাল ধরে তারা জোরে সোরে হাত চালাবে আর ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিতে থাকবে যেমন ইংরেজরা ভারত দখল করার কালে করেছিল। তারা ভারতের অর্থনৈতিক উৎসগুলো নিজেরা করায়ত্ত করে নিয়েছিল, তদ্রুপ ইচ্ছাই জার্মান ও ইতালিয়দের হবে। তারাও চাইবে যে আমরা এখন এই সমস্ত নৌপথের নিয়ন্ত্রণাধীকার নিজেদের করায়ত্ত করবো, এখানকার জ্বালানি তেলের উৎস, স্বর্ণ আর অন্যান্য সব খনিজ সম্পদ থেকে আমরাই মুনাফা লুটবো আর এভাবে তারা এক-দেড়শ বছর ধরে এই লুণ্ঠন চালিয়ে যাবে। কিন্তু ইংরেজদের উপমা, বৃদ্ধ সেই ব্যবসায়ীর ন্যায় হবে যে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কারণে ধন-সম্পদ বৃদ্ধির ইচ্ছাতো থাকবে কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি কখনও কখনও এমনও হয়ে যায় যে তখন তাদের মনে এই কথা উদিত হয় যে, ধন সম্পদ তো যথেষ্টই কামিয়েছি এখন অবসর নেয়া উচিত। একইভাবে এই জাতির (ইংরেজ) মনেও কখনও অধিক সম্পদ আহরণের ইচ্ছাও উদিত হয়। তবে কখনও আবার এই ধারণাও জন্মায় যে আমরা তো প্রচুরই উপার্জন করে নিয়েছি এখন দান করা উচিত। এভাবে কখনও বা তাদের শোষন করার ইচ্ছা জাগে আবার কখনও দয়ার। অতএব যাদের চিন্তা চেতনা এরূপ থাকে তাদের থেকে অবশ্যই অধিক সাচ্ছ্যন্দ লাভ হতে পারে কেননা শাসন কার্য চালাতে চালাতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত এই জাতি গুলো ধর্মের ব্যাপারে নাক গলানো পছন্দ করে না। রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া ধর্মের ব্যাপারে অদৃশ্য চাপ দেয়াটাও তারা পছন্দ করে না। যদি কোন খোদা থাকে আর তাঁর পক্ষ থেকে বিশ্বে কোন রসূল প্রেরীত হয় এবং তার শিক্ষা ও আদর্শের ওপর আমল করে আমাদের ইহজীবন সুসজ্জিত করা আবশ্যক হয়- তাতে কী'বা এসে যায়। এতদসত্ত্বেও এই জাতি গুলোর কার্যকর নীতি যদিও সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়ানুগ নয় তবুও একটা সীমা পর্যন্ত ন্যায়সিদ্ধ রয়েছে। এ জন্য প্রত্যেক ধর্মের নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই মিত্রশক্তির জয়লাভকে জাতীয় সমাজবাদীদের (অক্ষ: শক্তির) জয়লাভের চেয়ে অগ্রগণ্য রূপে কামনা করে।

ইংরেজদের বিজয়ের সাথে বলশেভিজমের বিজয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক

তবে এটা স্মরণ যোগ্য যে চলতি ঘটনা প্রবাহ কালে এই মিত্র শক্তির বিজয়ের সাথে বলশেভিজমের বিজয়ও জরুরী। যদিও ধর্মের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলশেভিজম ন্যাশনাল সোশালিষ্টদের চেয়েও বৈরী। অবশ্য তাদের বিজয়ে বিশ্ব ন্যাশনাল সোসালিষ্টদের (জাতীয় সমাজবাদী) বিপদ থেকে মুক্তি পাবে তবে ধর্ম ও ধর্মহীনতার এক নতুন যুদ্ধকালের উদ্ভব ঘটবে।

দরিদ্রদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মের প্রচেষ্টা

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি দারীদ্র দূরীকরণের জাগতিক প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছি। এবারে আমি সেই প্রচেষ্টা সমূহের কথা উল্লেখ করছি যা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বে এক নব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করে যাচ্ছে। ঐসব ধর্মগুলোর মধ্যে বড় বড় সব ধর্মাগুলো হলো–হিন্দুধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম, ইহুদী ধর্ম এবং ইসলাম। বর্তমানে এই সব ধর্মের অনুসারীদের পরিসংখ্যান নেয়া হলে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই এ দাবী উত্থাপন করবে যে, সেই ধর্মই সবচেয়ে উন্নত তারা নিজেরা যে ধর্মের অনুসরণ করছে আর সেই ধর্মের শিক্ষাই বিশ্বের দু:খ দুর্দশা মোচনে সক্ষম। হিন্দু বলে, একদিন এর পতাকা (নাওযুবিল্লাহ) পবিত্র মক্কায় রেখে দেয়া হবে। ইহুদী বলে ইহুদীয়তের শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ, খৃষ্টান

বলে আমাদের ঈসা মসীহ-ই যা কিছু করেছেন তা-ই পালনীয়। এদের মোকাবেলায় মুসলমানদের মধ্যেও উদ্দীপনা রয়েছে যে তারা বলিষ্ঠ ভাবে এ দাবী করে যে, ইসলামই যাবতীয় দু:খ কষ্ট মোচনের সফল চিকিৎসা প্রদান করে। দৃশ্যত বড় ধর্ম এগুলোই–হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী ও ইসলাম। এখন আমি নামায, রোযার প্রসঙ্গে যাচ্ছি না বরং আমি সেই বিষয়বস্তু বর্ণনা করছি যাতে বিশ্ব ক্ষুধা ও অনাহারে মরতে বসেছে। 'বিশ্ব' এর চিকিৎসার্থে বিভিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই জাগতিক আন্দোলনসমূহের মোকাবেলায় ধর্ম এ ব্যাপারে কী দৃষ্টি ভঙ্গি রাখে এবং কী নতুন ব্যবস্থা দেয় যা এই ধর্মগুলো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে আমি সর্ব প্রথম ইহুদীয়ত সম্পর্কে উল্লেখ করছি।

ইহুদী ধর্মমতে নব ব্যবস্থাপনার রূপ রেখা ও তার ফল

ইহুদীয়ত বিশ্বে যে ব্যবস্থাপনা উপস্থাপন করে তা কেবলই বর্ণবাদী ধ্যান ধারণা। এতে বিশ্বজনীন কোন বিষয় নেই। যেমন ইহুদী ধর্মমত বলে ইয়াকুবের বংশধরই খোদার প্রিয়। অবশিষ্ট সবাইকে তাদের অধিনস্ত থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধর্ম যদি কখনও বিশ্বের শাসনাধিকার লাভ করে তবে তো অবশ্যই এ শিক্ষার আওতায় নির্যাতন নিষ্পেষনের মাত্রা বেড়ে যাবে–কমবে না। ইহুদী ধর্মমতে আরো বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার ভাই থেকে সুদ গ্রহণ করো না (Deut: 23:19-20; lev.25:35-37) এবং তাদের বাদ দিয়ে যাকে খুশি তার কাছ থেকে সুদ নাও। এখন প্রশ্ন হলো সুদ নেয়া যদি পাপই হয় তবে এর স্বপক্ষে যুক্তি কী যে, এক ইহুদী থেকে না নিয়ে অইহুদী থেকে নেয়া যাবে! এর স্বপক্ষে এ ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কিছু হতেই পারে না যে ইহুদী ধর্মমত বর্ণ বৈষম্য মূলক একটি ধর্ম। তারা বলে অন্যদের থেকে নাও। অতএব বিশ্বে এই ধর্মমত জয়লাভ করে ফেললে তো এমন কর্মই হবে যে তারা সবার থেকে ট্যাক্স আদায় করতে শুরু করবে আর ইহুদীদের মধ্যে তা বিতরণ করবে। অনুরূপ ভাবে সদকা খায়রাতের নির্দেশ তারা দেয় বটে তবে সেই সদকা খায়রাত কেবল মাত্র স্বজাতিরাই প্রাপ্য হবে। এবারে কোন ইহুদী বাদশা হলে এই শিক্ষার আওতায় নাগরিকদের থেকে যত ট্যাক্সই আদায় করা হোক না কেন তার সবটাই শুধু ইহুদীরাই পাবে। এভাবে ইহুদী ধর্মমতে একথা বলা হয় না যে তুমি কোন দাস (কৃতদাস) রেখোনা বরং তারা বলে নিজ ভাইকে চিরতরে গোলাম বানিয়ে রেখো না অর্থাৎ প্রথমত তাকে গোলাম বানিয়ো না আর যদি বানিয়েই ফেলো তবে চিরতরে বানিয়ো না। এ প্রসঙ্গে ইহুদী ধর্মে এ আদেশ রয়েছে যে প্রত্যেক ক্রীতদাসকে সপ্তম বছরে মুক্ত করে দেয়া হোক, (Deut, 15:12;Exod.21:2) যদি কোন ইহুদী ব্যক্তি প্রথম বছর পাড়ি দেয়ার পর কোন দাস ক্রয় করে তবে এই শিক্ষানুযায়ী সেই ক্রীতদাস ছয় বছর পর মুক্ত হয়ে যাবে। আরো এক বছর পাড়ি দেয়ার পর সেই ক্রীতদাসকে অপর কেউ কিনলে পাঁচ বছর পর সে মুক্ত হয়ে যাবে। আবার এভাবে ক্রীতদাস অবস্থায় দুই বছর পাড়ি দিলে চার বছর পর সে মুক্ত হয়ে যাবে, এভাবে তিন বছর , দুই বছর, এক বছর কাল ক্রীতদাস অবস্থায় কাটানোর পর সে আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে। (lev.25:39-46) অর্থাৎ এক জন ইহুদী ক্রীতদাস বেশি থেকে বেশি সাতবছর কাল ক্রীতদাস অবস্থায় কাটাতে পারে এর থেকে বেশি কাল কোন ইহুদীকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা যেতে পারে না। অন্য কোন জাতির লোক সারা জীবনভর দাসত্ব কাল কাটালেও সে ব্যাপারে ইহুদী ধর্মমতের কোন মাথা ব্যাথা নেই। ইহুদী ধর্মের আরো এক শিক্ষা এটা পাওয়া যায় যে, অন্য জাতির সাথে তাদের অত্যন্ত কঠোর আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেমন "When thou comest night unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it, And it shall be, if it make the answer of peace, and open unto thee, then it shall be that all the people that is found therein shall be tribuaries unto thee and they shall serve thee. And if it will make no peace with thee, but will make war against thee, then thou shalt besiege it. And when the Lord they God hath delivered it into thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword. But the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto theyself and thou salt eat the spoil of thine enemies, which the Lord the God hath given thee. Thus shalt thou do unto all the cities which are very far off from thee, which are not of the cities of this nations" (Deut, 20:10-15) এই হল নীতি যা ইহুদী ধর্মমত উপস্থাপন করে। ইহুদী শাসন আমল এলে তবে তো প্রাপ্ত বয়স্ক সব পুরুষেরা নিহত হবে, সব নারী ও শিশুদের দাস-দাসী বানিয়ে রাখা হবে আর কেনানে বসতী স্থাপনকারী খৃষ্টান পুরুষ নারী ও শিশুদের এমন কি সে স্থানের ঘোড়া গাধা ও কুকুর, বিড়াল এবং সাপ বিচ্ছু পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না, কেননা নির্দেশ রয়েছে যে, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণকারী প্রত্যেককে বধ করা হবে। এই নীতির আওতায় কতিপয়ের সাচ্ছন্দ লাভ হতে পারে বটে তবে বিশ্বের জাতিসমূহ তো পুরোপুরি ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। (চলবে)

ভাষান্তর : **মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্**

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

জমির দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'উশরি' বলা হয়। যেমন হেজায অঞ্চলের জমি বা যেসব এলাকার জমি মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছে আর তাদেরকে এর মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন জমির উৎপাদনের ওপর 'উশরি' ১/১০ যাকাত হিসেবে দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। তবে শর্ত এই, বৃষ্টির ওপর নির্ভশীল হয় আর উৎপাদিত শস্য ৫ ওয়াসক * (আনুমানিক ২১ মন)। উৎপাদন যদি এথেকে কম হয় তাহলে এর ওপর যাকাত ধার্য হবে না। অবশ্য উৎপাদন যদি ২১ মন বা এথেকে অধিক হয় তাহলে এর দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। জমিতে যদি কূঁয়ো বা খাল অথবা ঝরণার পানিতে সেচ দেয়া হয় তাহলে যাকাতের নিয়ম অর্ধ-দশমাংশ অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ। এ যাকাত দেয়া তখন আবশ্যিক হবে যখন এ জমি থেকে সরকার খাজানা আদায় না। *টীকা ঃ 'ওয়াসাক' এক প্রকার ওজনের নিরিখ। এক ওয়াসাক ৬০ সা' ১৬৫ লিটার। এ পরিমাপে গমের যে পরিমাপ হয় এদিক থেকে নিশ্চিতভাবে এর ওজন দাঁড়ায় এক ওয়াসাক =৩ মন ১৯ সের ৫৯ তোলা ৫ মাসা ২ রতি। সা' এর পরিমাপের অন্য গবেষণা অনুযায়ী এক ওয়াসাক ৩ মন ৭ সের ৫ তোলা (ইসলাম কা নেযামে মুহাসসিল,পৃষ্ঠা ৯৯)।

করে। খাজানা যদি নিরূপিত হয়ে থাকে তাহলে পরে নীতিগতভাবে যাকাত দেয়া আবশ্যিক হবে না। কেননা, একই জিনিস থেকে দু'বার স্থায়ী ট্যাক্স আদায় করা যেতে পারে না। যেভাবে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, নীতিগতভাবে জমির সেই ফসলের ওপর যাকাত দিতে হবে যা মজুদ করা যায় যেমন, শস্য, শুকনো ফল যেমন, খেজুর, কিসমিস প্রভৃতি। কিন্তু যেসব ফসল মজুদ করা যায় না যেমন, সজী বা খরবুজা বা তাজা ফল প্রভৃতি তখন এগুলোর ওপর যাকাত আদায় জরুরী নয়। জমি যদি ভাগে দেয়া হয় তাহলে এজমালী ফসল থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। এরপর জমির মালিক ও ভাগীদারের মাঝে অবশিষ্ট ফসল বন্টন করা হবে।

জংলী মধু, যার ব্যাপারে মৌমাছি পালনের জন্যে মানুষকে টাকা-পয়সা ব্যয় করতে হয় নি সেক্ষেত্রে ১০ মশক সমান আহরিত হলে এক মশক যাকাত হিসাবে অবশ্য-দেয় হবে। সুতরাং মধুর নিসাব ১০ মশক স্বীকার করা হয়। মৌমাছি পালনের মাধ্যমে যে মধু আহরিত হয় এর যাকাত নেই।

পশুর নিসাব ও যাকাত আদায়ের নিয়ম

যাকাতের পশু অর্থে গৃহপালিত পশু যেমন, উট, গাভী, মোষ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি। ঘোড়া খচ্চর ও গাধার প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ একে যাকাতের মাল হিসাবে গণ্য করেছেন আবার কেউ কেউ করেন নি। তদুপরি গৃহপলিত পশুর ওপর তখন যাকাত অবশ্য-দেয় হবে যখন এরা প্রাকৃতিক চারণ ক্ষেতে চরবে ও লালিত-পালিত হবে এবং ঘরে তাদের খাবার সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না।

নিসাব

উটের যাকাতের নিসাব পাঁচ। কারও নিকট যদি ৫টি থেকে কম উট থাকে তাহলে এর ওপর যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না।

প্রতি ৫ থেকে ৯টি উটের যাকাত ১টি ছাগল বা এর মূল্য। এর পর অতিরিক্ত প্রতি ৪০টি উটের জন্যে দু'বছর বয়সের ১টি উটনী এবং ৫০টি উটের জন্যে ৩ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গাভী ও মোষের যাকাত

গাভী ও মোষ একই শ্রেণীভুক্ত। আর এতে বলদ ও পুরুষ মোষও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমা এর সম্মিলিত সংখ্যার ওপর নির্ণিত হয়। প্রত্যেক পশুর আলাদা আলাদা সংখ্যার ওপর নয়; তা কোন একটির সংখ্যা নিসাবের সংখ্যা থেকে কম হোক না কেন। এসব পশুর (গাভী ও মোষ) যদি সম্মিলিত সংখ্যা নিসাবের সমান সমান হয় তাহলে যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য। এরপর যেখানে 'গাভী' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে গাভী, বলদ, পুরুষ মোষ ও স্ত্রী মোষ প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত হবে।

গাভীর নিসাব ৩০টি। ৩০টির কম পশুর জন্য যাকাত নেই। আর এসব জন্তর যাকাতের নিয়ম প্রতি ৩০টি পশুর জন্য এক বছর বয়সের ১টি গাভী আর প্রতি ৪০টি পশুর জন্যে ২ বছর বয়সের একটি গাভী প্রতি ৩০ থেকে ৩৯টি গাভী পর্যন্ত যাকাত হবে ১ বছর বয়সের ১টি গাভী বা এর সমমূল্য।

ছাগল ভেড়ার যাকাত

ছাগল, ভেড়া বা এ জাতীয় পশু আর দুম্বা একই শ্রেণীতে গণ্য করা হয়। আর এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমাও এদের সম্মিলিত সংখ্যার ওপর নির্ধারিত হবে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক পশুর ওপর হবে না। পরে যেখানে 'ছাগল' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে ছাগল, পাঠা, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, দুম্বী সব অন্তর্ভুক্ত হবে। ছাগলের নিসাব হলো ৪০টি। এর কম সংখ্যার জন্য যাকাত দিতে হবে না। প্রতি ৪০ থেকে ১২০ টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ১টি ছাগল বা এর সমমূল্য। এর বেশি হলে প্রতি ১০০ ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। (ফিকাহ্‌ আহমদীয়া পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৫)।

কারও কাছে যদি বিভিন্ন রকমের পৃথক পৃথক যাকাতের নিসাবসম্বলিত সম্পদ থাকে কিন্তু ওগুলোর কোনটাই স্বয়ং নিসাব পরিমাণ নয় বরং কম ; এমনকি সবগুলোর সম্মিলিত মূল্য হাজার টাকায় পৌঁছলেও যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না। যেমন কারো নিকট ৪টি উট, ২৬টি গাভী, ৩৯টি ছাগল, ৫১ তোলা রূপা আছে এক্ষেত্রে কোনটির ওপরই যাকাত দেয়া হবে না আর সম্মিলিত মূল্যের ভিত্তিতেও যাকাত আদায় করা যাবে না। কেননা, এর মাঝে প্রত্যেক সম্পদের যাকাতের নিসাব আলাদা আলাদা আর তা এ সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন ঃ সোনা থাকলে এর যাকাত কীভাবে আদায় করা যায়?

উত্তর ঃ সোনার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিতে রূপা হলো মাপকাঠি। অর্থাৎ কারো কাছে যদি ৫২.৫ তোলা রূপার সম মূল্যের সোনা থাকে তাহলে এর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। তবে শর্ত এই যে, সোনা এমন অলংকার আকারে না হয় যা সাধারণত নিজে ব্যবহার করা হয় আর কখনও কখনও পরে চাইলে কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া হয় আর কৃপণতা দেখানো হয় না।

প্রশ্ন ঃ বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিলো পরে বছরের মাঝামঝি সময়ে এতে প্রবৃদ্ধি ঘটলে এরকম আধিক্যের কারণে যাকাতের ব্যাপারে আদেশ কী?

উত্তর ঃ বছরের মাঝামাঝি যদি মূলধনে প্রবৃদ্ধি যেমন, ১০ পরিণত হয় ১৫ হাজারে তাহলে যাকাত ১৫ হাজারের ওপরে ধার্য হবে, এমনকি ৫,০০০/= টাকার ব্যাপারটি এমন হয় যে, বছর শেষ হওয়ার এক দু'দিন পূর্বে পাওয়া গেলেও। মোটকথা অতিরিক্ত আয় আগেই মূলধনের অধীন হবে আর এর জন্যে বছর শেষ হওয়ার কোন শর্ত প্রয়োজন হবে না।

নাজাতের দশক ও ইতেকাফ

মাহমুদ আহমদ সুমন

রমযানের শেষ দশক নাজাত বা মুক্তির দশক আর এতে দোয়া কবুলিয়তের বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়। এই শেষ দশকে ইতেকাফকারীরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই ভালবাসায় আত্মমগ্ন হয়ে ইতেকাফে বসেন আর এই দশদিন গভীর ভাবে দোয়াতে রত থাকেন।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে হযরত নবী করীম (সা.) বলেন, 'সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে রমযানের শেষ দশকের চেয়ে মহৎ ও প্রিয় আর কোন দিন নেই'। অর্থাৎ এই দশকে আল্লাহ্ তাআলা অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি মাহাত্ম্য দান করেন। নইলে, কোন দিন বা রাত আল্লাহ্‌র কাছে কী করে মহান হতে পারে? মহান এ দিক দিয়েই যে, এই দশকে আল্লাহর সংস্পর্শে যারা আসে তাদেরকে এটি মহানে পরিণত করে। মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যতো নিবিড় হবে, বান্দাও ততো মহানে পরিণত হতে থাকবে।

'বুখারী, কিতাবুস সওম', হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, যখন রমযান শেষ দশকে প্রবেশ করতো বা শেষ দশক শুরু হতো, তখন হযরত রসূল করীম (সা.) কোমর বেঁধে তাতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাঁর রাতগুলোকে জীবিত করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকেও ইবাদতের জন্য জাগাতেন। পরিবার-পরিজনকে জাগানো তো হযরত রসূল করীম (সা.) এর সব সময়ের সাধারণ রীতি ছিল এবং তাঁর রাত্রিগুলোও (ইবাদতে) জীবিত-ই থাকতো।

এই হাদীস থেকে অধিকতর চেষ্টা-প্রয়াস এবং অধিকতর মনোনিবেশ প্রমাণিত হয়। অতএব, যারা আগে থেকে তাহাজ্জুদগুজার রয়েছেন তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই দশ রাতের তাহাজ্জুদের মধ্যে নতুন কোন বৈশিষ্টের সৃষ্টি হওয়া চাই, যা আমাদের পূর্বে আদায়কৃত তাহাজ্জুদে ছিল না। এই শেষ দশকে একনিষ্ঠভাবে খোদাকে ডাকার ও লাভ করার উদ্দেশ্যে ইতেকাফের ব্যবস্থা ইসলামে রাখা হয়েছে। 'ইতেকাফ' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো কোন স্থানে অবস্থান করা। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্দর নিয়তসহ এমন মসজিদে অবস্থান করা যেখানে ইমাম ও মোয়াজ্জিন অবস্থান করেন এবং বাজামাত নামাজ হয় আর ইতেকাফে বসতে হয় জামে মসজিদে। রমযানের ২০ তারিখের সন্ধ্যা অথবা ২১ রমযানের সকাল থেকে ১০ দিন ইতেকাফ করা সুন্নত। চাঁদ রাতে অথবা ঈদের প্রভাতে ইতেকাফ ১০ দিন পূর্ণ করে উঠতে হয়। ২৯ দিন রোযা হলে ৯ দিন পুরো করতে হয়। ইতেকাফের সময় মসজিদে অবস্থান করে বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকতে হয়।

ইতেকাফ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা যখন মসজিদে ইতেকাফ অবস্থায় থাক তখন আপন স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না" (সূরা বাকারা, ১৮৮)। মু'মিন নর-নারীর জন্য ইতেকাফ একটি বিশেষ পুণ্যের কাজ। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) নিজে ইতেকাফ করতেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে ইতেকাফ করার জন্য আদেশ দিতেন। আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি (সা.) এ আমল অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর (সা.) ইন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র বিবিগণ ইতেকাফ করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন 'রসূলে করীম (সা.) রমযান মাসের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করতেন। এক বছর তিনি কোন কারণবশতঃ ইতেকাফ করেননি; কিন্তু পরের বছর তিনি ২০ দিন ইতেকাফ করেছিলেন' (তিরমিযী)। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন 'যে ব্যক্তি রমযানের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করবে সে যেন দু'টি হজ ও দুটি ওমরাহ্ করে' (বায়হাকী)।

ভেবে দেখুন, ইসলামে ইতেকাফের গুরত্ব কতটা। রসূল (সা.) ইতেকাফকে হজ্জের সাথে তুলনা করেছেন। তাহলে বুঝতে হবে ইতেকাফ কত নিষ্ঠা ও গভীর মনযোগের সাথে পালন করা উচিত। যারা সময় সুযোগ পায় তাদের কর্তব্য এ নেক কর্ম থেকে ফায়দা হাসিল করা। সেই মহান রসূল (সা.) যাঁর জন্য জগত সৃষ্টি, যাঁর ছিল না কোন পাপ; তিনি যেখানে সব সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইতেকাফ করতেন তাহলে আমরা কেন সে আমল থেকে পিছিয়ে থাকবো? তাঁর (সা.) দোয়ার ফলেই আজও ইসলাম দৈনন্দিন নিত্য নতুন সফলতা লাভে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক যুগেই হযরত (সা.)এর দোয়াসমূহ এর সাক্ষী যে, আল্লাহ বিদ্যমান এবং তাঁকে কেউ অন্বেষন করলে সে তাঁর দেখা পায়।

ইতেকাফের এই দিনগুলোতে বিশেষ এক মুহূর্ত আসে, তাই প্রতিটি সময় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা চাই। লায়লাতুল-কদরও হয়ত এদিনগুলোতেই আসবে। আল্লাহ ভাল জানেন কে এর সৌভাগ্য পাবে আর কে পাবে না। কিন্তু যার-ই এ সৌভাগ্য লাভ হয় অথবা অন্তত যার এই ধারণা থাকে যে, এই লায়লাতুল কদর পাবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটবে তাঁর পক্ষে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ঐ দোয়াটি পড়া উচিত, যা কিনা লায়লাতুল-কদরের দোয়াসমূহের প্রাণস্বরূপ। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি নবী করীম (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি জ্ঞাত হই যে, তা লাইলাতুল-কদর বটে, তাহলে সে মুহূর্তে আমি কি দোয়া চাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তখন এই দোয়া করো; **"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউয়্যুন, তুহিব্বুল আফ্ওয়া, ফা'ফু আন্নি"** (জামে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)। অর্থ–হে আমার আল্লাহ ! নিশ্চয়ই তুমি মার্জনার মূর্ত প্রতীক। তুমি মার্জনাকে ভালবাস। এই রাত্রের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল করিম (সা.) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়' (বুখারী)। আমাদের উচিত বিন্দু পরিমাণ অজুহাত না দেখিয়ে আল্লাহ ও রসূলের আদেশ পালনে ব্রত হওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রমযানের শেষ দশকের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝার, বেশি বেশি খোদাকে ডাকার এবং ইতেকাফ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করার কল্যাণ

কোহিনুর বেগম (বীথি)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন বলেছেন –"আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্‌যারিয়াতে : ৫৭) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন–"তোমরা রহমান আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তোমরা শান্তির সৌগাত ছড়াবে, তবেই তোমরা চির শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী)

ইবাদতের অনেক শাখার মধ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ-সম্পদ খরচ করা অন্যতম। এটি অবশ্যই একটি নেক কাজ আর আল্লাহ্‌ নেক কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন।

প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ। শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য তিনি কাউকে এই অনুগ্রহ দান করেন নি। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ নিজের ও পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন, ধর্মের প্রচার এবং তালিম-তরবিয়তী কর্মকান্ডে ব্যয় করতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–"হে যারা ঈমান এনেছ! আমরা তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি তা থেকে খরচ কর সেই দিন আসবার পূর্বে, যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ চলবে না, বস্তুতঃ কাফিররাই যালিম।" সূরা বাকারার ২৬২ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা করেছেন–"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায় যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে আর প্রতিটি শীষে থাকে একশত বীজ, আল্লাহ্‌ যার জন্য চান তা আরো বৃদ্ধি করে দেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞানী।"

ধন-সম্পদ যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা হয় তাহলে তা কখনও কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। কেননা সবকিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারেই হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে মানুষ কুরবানীর মাধ্যমে এমন এক আনন্দ অনুভব করে যাতে তার আশা সতেজ হয়, ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মজবুত হয়। মহান আল্লাহ্‌ সূরা মুহাম্মদ এর ৩৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন–"শোন! তোমরা সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ এমনও আছে যারা কার্পণ্য করে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের প্রাণের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করে। বস্তুত আল্লাহ্‌ অসীম সম্পদশালী এবং তোমরা অভাব গ্রস্ত এবং যদি তোমরা বিমুখ হয়ে যাও তাহলে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসবেন, তখন তারা তোমাদের ন্যায় হবে না।"

আমাদের মালী কুরবানীর সাথে সমাজের মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য জড়িত। এ ময়দানে অবজ্ঞা, অবহেলা দেখালে ভাগ্যতাড়িত মানুষের হাহাকার আর আর্তনাদ পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে আর এ বিপর্যয়ের রক্ষাকবচ হিসেবে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে– "আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর ; নিজেদের হাত দ্বারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করবে না, সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎকর্মকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা : ১৯৬)।

প্রকৃত মু'মিন কখনই ধন-সম্পদ গুদামজাত করে রাখে না। সে নিজের ধন-সম্পদ দ্বারা সর্বদা দেশ, জাতি ও ধর্মের কল্যাণ সাধনে তৎপর থাকে। কারণ সে জানে এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, স্থায়ী জীবন হচ্ছে পারলৌকিক বা জান্নাতী জীবন। সূরা তাওবার ১১১নং আয়াতে বলা হয়েছে –"নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বলে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।" যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সিন্দুকে তালা দিয়ে রাখে তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–"দুর্ভাগ্য প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদ আরোপকারীর জন্য; যে ধন-সম্পদ জমা করে আর তা বারবার গণনা করে এবং মনে করে যে, ধন-সম্পদই তাকে অমর করবে। কখনও নয়। নিশ্চয় সে হুতামায় (আগুনে) নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা হুমাযাহ্‌)। সূরা বাকারার ২৬৬ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, "যারা নিজের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত বাগানের মত," এখানে উঁচুস্থান বলতে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত অক্ষত স্থানকে বুঝানো হয়েছে। আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে ব্যয় করি এবং আমরা যে বাজেট লেখাই এবং আমাদের যা আয়, এসব সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা ভালভাবে জানেন, তাই এ ব্যাপারটি সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। পুণ্যের প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেতে হলে নিজের বাজেটের হিসাব ঠিক করাতে হবে এবং সঠিকভাবে আদায়ও করতে হবে যেন আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা উৎকৃষ্টতর হয় এবং আমরা পুণ্য কাজে উন্নতি করতে পারি।

আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ইচ্ছা রাখতেন এবং এর ওপর এমনভাবে কাজ করতেন যে তাঁর নিকট কখনও ধন সম্পদ জমা হতো না। তিনি সাহাবাদেরও (রা.) এ পদ্ধতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিতেন আর একে খুব বড় প্রতিদান এবং পুরস্কারের

কারণ হিসেবে বর্ণনা করেন। যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে রসূল (সা.) বলেছেন–"কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয়কারীগণ আল্লাহ্‌র পথে তাদের ব্যয়কৃত ধন-সম্পদের নীচে থাকবেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। কিন্তু অন্য স্থানে এটাও বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় যেন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না হয় বরং একনিষ্ঠভাবে যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয়। রসূল (সা.) আরোও বলেছেন –"হে আদম সন্তানগণ! তোমরা স্বপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করো। তোমাদের জন্যও খরচ করা হবে।"

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন–"তোমাদের মধ্যে সে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে যার হাত লম্বা। আয়শা (রা.) বলেন, এ কথা শুনে আমরা হাত মাপতে শুরু করলাম, রসূল (সা.) এ দৃশ্য দেখে বললেন, আমি তো দানের হাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।" (বুখারী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন –"প্রত্যেক দিন সকালে দু'জন ফেরেশ্‌তা নাযেল হন। তাদের মধ্যে একজন, বলে হে খোদা! দান করে এমন দয়ালু ব্যক্তিদের আরো দাও এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী আরো সৃষ্ট কর। অন্যজন বলে, হে খোদা! ধন-সম্পদ আটকে রাখে এমন কৃপণ ব্যক্তিদের ধ্বংস কর এবং তাদের ধন-সম্পদ নিপাত করে দাও।" (বুখারী কিতাবুল যাকাত)।

দানশীল লোকেরা খোদার দৃষ্টিতে প্রিয় এবং লোকদের কাছে ভালোবাসা ও পুরস্কারের অধিকারী হয়। হুযূর (সা.) বলেছেন –"দানশীল লোকেরা আল্লাহর নিকট, লোকদের নিকট ও বেহেশ্‌তের নিকটে থাকেন এবং দোযখ থেকে দূরে থাকেন।"

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী যা কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা হয় তাকেই রসূল (সা.) পরকালের সম্পদ হিসেবে সাব্যস্ত করেন। তিনি (রা.) বলেন, একবার রসূল (সা.) একটি বকরী জবাই করে তার মাংস গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেন। আর সামান্য কিছু খাওয়ার জন্য রেখে দেন। আঁ হযরত (সা.) যখন জিজ্ঞাসা করেন কি পরিমাণ মাংস বেঁচেছে তখন জবাবে আয়শা (রা.) বলেন দশ ভাগের এক ভাগ বেঁচে গেছে। এ কথা শুনে হুযূর (সা.) জবাব দেন দশ ভাগের এক ভাগ ছাড়া সমস্ত মাংসই বেঁচে গেছে।" অর্থাৎ যে পরিমাণ মাংস দান করা হয়েছে তা সওয়াব পাওয়ার জন্য বেঁচে গেছে আর যা নিজে খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছে তা থেকে সওয়াব পাওয়া যাবে না। এজন্য প্রকৃতপক্ষে বাঁচে নি।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মন্তব্য হলো–"যে ব্যক্তি মহৎ কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করবে আমি আশা করি না যে, সেই অর্থ ব্যয়ের কারণে তার অর্থের কোন স্বল্পতা থাকবে বরং তার অর্থের মধ্যে বরকত হবে।" তিনি (আ.) বলেন, "সেই সব লোকের জন্য আফসোস, যাদের নিকট স্ত্রী, সন্তান প্রতিপালন ও ভোগবিলাসের জন্য সবকিছুই থাকে কিন্তু ইসলামের সেবার জন্য তাদের পকেট শূন্য হয়ে যায়। (ফতেহ ইসলাম)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরোও বলেছেন, "এটা ভেবো না যে, তোমরা তোমাদের অর্থের একাংশ দিয়ে বা অন্য কোন ধরনের সাহায্য করে খোদা বা তাঁর প্রেরিত পুরুষকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছো। বরং তিনি যে তোমাদেরকে এই খেদমতের জন্য ডাকেন সেজন্য তোমাদেরই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর্থিক কুরবানী ঈমান পরখের এক ব্যারোমিটার স্বরূপ। আল্লাহ্‌র রাস্তায় গুণে গুণে খরচ করলে আল্লাহ্ মানুষকে গুণে গুণেই দান করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–"তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে খরচ না করো।"

শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখিয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ-সম্পদ খরচ করা থেকে বিরত রাখে। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে খোদাকে ভালোবেসে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে বেশি বেশি আল্লাহ্‌র রস্তায় আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে সতেজ ও সুদৃঢ় করার তৌফিক দিন, আমীন।

ঈদ মুবারক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক - লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক।

পবিত্র ঈদুল ফিতর সবার জীবনে বয়ে আনুক অনেক অনেক আনন্দ আর কল্যাণ।

–সম্পাদক

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

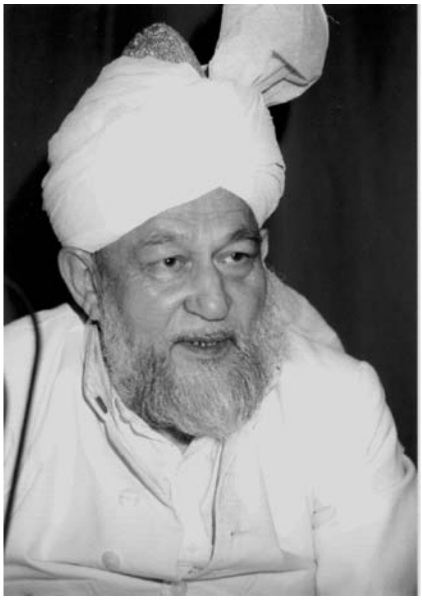

সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

(৭ম কিস্তি)

১১-১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৬তম সালানা জলসা। এ মহতী জলসার প্রাক্কালে বাঙালি আহমদীদের হৃদয়ের পরশমণি জ্বালানোর মানুষ মির্যা তাহের আহমদ সাহেব তাঁর সহধর্মিণী ধর্মপরায়ণ মহিলা আসেফা বেগম সাহেবাসহ ঢাকায় আগমন করেন। তখন তাঁর সাথে আরো সফর সঙ্গী ছিলেন। (১) মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব সম্পাদক আল ফোরকান সাবেক আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী মিশর ও প্যালেস্টাইন (২) এডভোকেট মির্যা আব্দুল হক সাহেব সাবেক পশ্চিম পাঞ্জাব ও বাহওয়ালপুরের প্রাদেশিক আমীর এবং (৩) মাওলানা মোহাম্মদ সাদেক সাহেব সাবেক আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী ইন্দোনেশিয়া ও মালেশিয়া। ঢাকার দারুত তবলীগে তখন পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের অনুরোধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) একটি ইট কাদিয়ান থেকে সংগ্রহ করে দোয়ার মাধ্যমে রাবওয়া থেকে মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দ্বারা ঢাকায় প্রেরণ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বাদ জুমুআয় মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হয়। মোহতরম আব্দুল হক সাহেবের দোয়ার পর এদেশের মাটি ও মানুষের ভালোবাসার মানুষ মির্যা তাহের আহমদ সাহেব কাদিয়ানের পবিত্র ইটটির দ্বারা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.) যখন আবির্ভূত হবেন তিনি দেশে দেশে মসজিদ নির্মাণ করবেন।' এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলনে তাঁর বংশোদ্ভোত ও স্থলাভিষিক্ত খলীফাতুল মসীহের সুযোগ্য উত্তরসূরী মির্যা তাহের আহমদ সাহেব কর্তৃক ঢাকার দারুত তবলীগে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এটা এদেশের আহমদীয়াতের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ও গৌরবের বিষয়। অতঃপর একে একে ইট স্থাপন করেন মির্যা আব্দুল হক সাহেব, মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব ও মোহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং এ দেশীয় বুযূর্গ মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, আনোয়ার আহমদ কাহলুন সাহেব, এবং ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সামসুর রহমান সাহেব।

বলাবাহুল্য, ঢাকার দারুত তবলীগের দ্বিতল পাকা মসজিদ নির্মাণ হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ও প্রচেষ্টার ফসল। তিনি এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধনের জন্য আশা করেছিলেন। কিন্তু এদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট হযরত আমীরুল মু'মিনীনের পদচরণ লাভের সৌভাগ্য হয়নি। ফলে হুযুরে দোয়া করে প্রেরিত ইটের মাধ্যমে মসজিদ উদ্বোধন হয়। পরবর্তীতে তাঁর দোয়া ও দিক নির্দেশনায় ১৯৭৮ সালে মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। তখন এর উদ্বোধনের জন্য তাঁর নিকট আরজ করা হলে হুযুর সালেস (রাহে.) তা মঞ্জুর করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বাংলাদেশে আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত খলীফার শুভাগমনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। এদেশের মাটি ও মানুষের মাঝে তাঁর চরণধূলি পরেনি। এমতাবস্থায় ১৯৮২ সালে তাঁর ওফাত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে সুদীর্ঘ ২১ বছর সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি বিশ্বের অনেক দেশ সফর করেছেন। তাঁর যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত বাংলাদেশেও আসার আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু বাঙালি জাতির ভাগ্যে সুপ্রসন্ন হয়নি বিশ্বের শান্তির দূতকে লাভ করার। বর্তমানে পঞ্চম খিলাফতের কাল চলছে। ফলে সুদীর্ঘ ৩১ বছর ধরে মসজিদ উদ্বোধনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। একমাত্র আলীমুল গায়েব আল্লাহ্ তাআলা জানেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কর্তৃক সংরক্ষিত মসজিদ কখন কার দ্বারা দ্বারন্মোচিত হবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন–অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁরই নিকট তিনি ছাড়া তা কেউ জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন। (আল আনআম : ৬০)।

দারুত তবলীগ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর প্রাদেশিক জলসার অধিবেশন শুরু হয়। জলসার প্রধান আকর্ষণ সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবসহ আগত সম্মানীত খোদার প্রেমিকরা বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতির

আসন গ্রহণ এবং ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় হৃদয়গ্রাহী অমূল্য ভাষণ দান করেন। ফলে ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলার জলসা সার্বিকভাবে সার্থক ও সফল হয়। জলসার দ্বিতীয় দিন ১২ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব মির্যা আব্দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মজলিসে ইন্তেখাবের (নির্বাচনী সংস্থা) অধিবেশন হয়। প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব সর্বাধিক ভোট পান। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে,) তাঁকে তিন বছরের জন্য পুনরায় প্রাদেশিক আমীর নিয়োগ করেন। ১৩ তারিখ সকালে কেন্দ্রীয় নায়েব সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাথে এক সভায় মিলিত হন। স্থানীয় কায়েদ ওবায়দুর রহমান ভূঞা এ মহীমান্বিত অতিথির সম্মানার্থে সভার আয়োজন করেন। উপস্থিত খোদ্দাম তাদের হৃদয়ের সবটুকু ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উজার করে তাঁকে বরণ করে নেন। বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। সম্মানিত অতিথি বাঙালি খাদেমদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। তবে খোদ্দামের উপস্থিতি এবং মজলিসের কাজের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তিনি অসন্তুষ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণে তৎকালীন মজলিসের কায়েদ ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব বলেন–

"সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব আমাকে খোদ্দামের এক সভার আয়োজন করতে নির্দেশ দেন। আমি ব্যবস্থা করি। মজলিসের সদস্য ৮০ জনের মধ্যে ৪০ জন উপস্থিত হন। উপস্থিতি কম দেখে তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পাঞ্জাবী এক খাদেম শেখ জাফর আহমদ বলেন, অনেকের মাঝে দুর্বলতা বিরাজ করে, তাই উপস্থিতি কম হয়েছে। তখন হুযূর সকলকে জামা'তের কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য নসিহত করেন এবং মজলিসকে গতিশীল করে তোলার জন্য দিক নির্দেশনা দেন। আমাকে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় যোগদান, মজলিসে কাজের উত্তম নেতৃত্ব প্রদানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং অধিক সদস্যের উপস্থিতিতে পুনরায় একটি সভার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ করেন। অতঃপর আমি সকলের উপস্থিতিতে পুনরায় একটি সভার আহ্বান করি। কিন্তু তখনও আশানুরূপ উপস্থিতি হয়নি। সাহেবযাদা মির্যা সাহেব এতে খুব অসন্তোষ হন। তিনি বলেন,–'আপনারা কি চান আপনাদের অবস্থা হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আই.)-এর কাছে পেশ করি।' তখন আমরা সকলে ক্ষমার আরজ করে সবিনয়ে বলি–'আমাদের জন্য দোয়া করেন। আমরা মজলিসের কাজে আরো গতিশীল হবো। যারা সভায় আসেনি, মজলিসের কাজ থেকে দূরে থাকে তাদেরকে কর্মতৎপর করে তোলবো এবং সবাই বেশি বেশি করে কাজ করবো (ইনশাআল্লাহ)।'

তখন তাঁর আদেশ পালনে কেন্দ্রীয় ইজতেমা রাবওয়ায় যাবার মতো আমার আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাই দোয়া করতে থাকি। কিছু দিন পর ১৯৬৬ সালের শেষ দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব আমাকে রাবওয়ায় মজলিশে শূরায় যোগদানের আদেশ করেন। ফলে আমি জামা'তের শূরার প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী এবং জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গদের সান্নিধ্যে তাদের দোয়া ও স্নেহস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য হয়। হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সাথে সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত খুশী হন। তিনি মজলিস পরিচালনায় আমাকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করেন।

১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে আমি PIA তে চাকুরী নিয়ে করাচী যাই। ঢাকা মজলিসের অস্থায়ী কায়েদের দায়িত্ব নূরুদ্দীন আহমদ নিকট হস্তান্তর করি। কিছু দিন পর সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব করাচী আসেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে পূর্ব পাকিস্তানের জামা'ত ও ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন এবং কায়েদ হিসাবে নূরুদ্দীন আহমদ কেমন হবেন জানতে চান। আমি বলি তিনি দায়িত্বশীল এবং জামা'তের একজন অনুগত খাদেম। তাঁকে নিয়োগ দেয়া যায়। অতঃপর তাঁকে কায়েদ পদে স্থায়ী নিয়োগ প্রদান করেন। সেই সময় করাচী জামা'তের আমীর ছিলেন চৌধুরী মুক্তার আহমদ সাহেব এবং খোদ্দামের কায়েদ চৌধুরী সামীম আহমদ খান। আমার সাথে করাচী ছিলেন নাজির আহমদ ভূইয়া বাঙালি খাদেম। মির্যা সাহেব স্থানীয় আমীর ও কায়েদ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন–বাঙালি এই দুই খাদেমকে মজলিসের সদস্যভুক্ত করুন। কাজে লাগান। ফলে আমি মজলিসে আমেলার নায়েম তাহরীকে জাদীদ এবং নাজির আহমদ ভূইয়া নায়েম ইসলাহ্ ও ইরশাদ নিযুক্ত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সাথে করাচীতে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি তাঁকে বলি–বাঙালিরা স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেছে, হয়তো দেশটি স্বাধীন হয়ে যাবে। তখন তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করে বলেন–আমরা আহমদীরা ভাই ভাই। প্রায় ৫৬ টি দেশে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করেছে। যদি আরও একটি দেশ বাড়ে ক্ষতি নেই। তবে প্রধান সমস্যা হলো এটি এত ছোট ও দরিদ্র আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা কঠিন।

১৯৭৩ সালে আমি দেশে ফিরে আসি। ১৯৭৭ সালে মজলিসে আনসারুল্লাহ্

বাংলাদেশের নায়েমে-আলা নিযুক্ত হই। ১৯৭৯ সালে হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব বিশ্ব মজলিসে আনসারুল্লাহ্ সদরের দায়িত্বে আসীন হন। তিনি আমাকে মজলিস পরিচালনায় উত্তম দিক নির্দেশনা দেন এবং অনেক নসিহত করেন। ১৯৮০ সালে আমি মজলিস আনসারুল্লাহ্র কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদান করি। তখন মির্যা সাহেব রাবওয়ায় আমাকে দেখেই বাইসাইকেল থেকে নেমে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জিজ্ঞাসা করেন–ক'দিন আছি। আমি তাড়াতাড়ি চলে যাবো বলি। কিন্তু তিনি এতে খুশী হননি, তিনি বলেন–এত তাড়াতাড়ি কেন ফিরে যাবেন। আরও ক'দিন থাকেন। আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করি। তিনি একজন সাধারণ মানুষের মত বাই সাইকেল চড়ে রাবওয়া থেকে অন্যত্র যাচ্ছিলেন। তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানতো না দু'বছর পরই এ মহান ব্যক্তিটি খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করবেন। সে সময় তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ব্যস্ত ছিলেন। বিয়েতে অনেক ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হয়। আমিও বিয়ের নিমন্ত্রণ কার্ড পাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ছিলেন। মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর মত মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যে তাঁর দোয়া ও স্নেহস্পর্শ লাভে আমি ধন্য হয়েছি।”

১৯৬৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক জলসার পর সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জামা'ত সফর করেন। এদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার সমুদ্র সমতলে অবস্থিত সুন্দরবন যান। বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক মনোহরী সৌন্দর্যের এক মোহনীয় লীলাভূমি সুন্দরবন। এটা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ অরণ্য এবং প্রাকৃতিক রহস্যের সৌন্দর্যে গড়ে উঠা ভার্জিন অরণ্য নামে বিখ্যাত। এ সুন্দরবনের জনপদের মসীহেজ্জামানের শিষ্যত্ব গ্রহণকারী সুন্দর মানুষগুলিকে দেখতে যান জামা'তে আহমদীয়ার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উত্তম সুন্দর মানুষ মির্যা তাহের আহমদ সাহেব। প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েবে আমীর ও পাক বে (Pak Bay) কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আনোয়ার আহমদ কাহলুন সাহেব এ সম্মানিত অতিথির ভ্রমনের জন্য তাঁর কোম্পানীর লঞ্চের ব্যবস্থা করেন। ফলে সাহেবযাদা মির্যা সাহেব তাঁর সহধর্মিণী এবং এদেশীয় তার সফরসঙ্গীসহ সুসজ্জিত লঞ্চে খুলনা থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখ বিকাল ৪টায় হরিনগর লঞ্চঘাটে পৌঁছেন। তখন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সামসুর রহমান সাহেবসহ বিরাট কাফেলা অপেক্ষামান ছিলেন। লঞ্চ থেকে অবতরনের পর এ মহীমান্বিত অতিথিকে তাঁরা প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে আধ্যাত্মিক জগতের বাদশা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বংশোদ্ভোত সাহেবযাদা সুদর্শন সুপুরুষের সাথে আলিঙ্গন করেন। সকলই প্রাণে প্রাণে মিশে যায়। চার কিলোমিটার পদব্রজে যতীন্দ্রনগর প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। পরদিন স্থানীয় জামাতের সাত/আট জন কর্মোদ্যোমী খাদেমসহ খোদার সৃষ্টির রহস্যে বিভোর ও ভ্রমন প্রিয় মানুষ মির্যা সাহেব সুন্দরবনে জঙ্গলে যান। তখন তাঁর নিকট ছিল একটি রাইফেল এবং সহশিকারী দুই/তিন জনের কাছে ছিল বন্দুক। সারা দিন গভীর অরণ্যে ঘুরে ঘুরে অবলোকন করেন সুন্দরবনের অপরূপ নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য। শিকারে তিনি একটি পাখীর প্রতি গুলি ছুড়েন। সাথী ওয়াজেদ মল্লিক সাহেব ১২/১৪ কেজি ওজনের একটি হরিণ শিকারে সক্ষম হন। পরন্ত বিকালে সতীর্থদের সাথে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়িতে ফিরে আসেন ।

জামাতের সদস্যদের তালিম-তরবিয়ত ও তবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক সভা করেছেন। মসজিদে প্রতিবার নামাযের পর ধর্মীয় আলোচনার আসর বসে। তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলম থেকে অনেক নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন, যা শ্রোতাদের হৃদয়ে দানা বাঁধে। মনকে উজ্জীবিত করে তোলে। আহমদীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কুশল বিনিময়ে আত্মার আত্মীয়তার বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করেন। ফলে জামাতের সদস্যদের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। তাঁর সুযোগ্য ধর্মপরায়ণ সহধর্মিণীকে দেখতে গ্রামের মহিলারা ছুটে আসেন। আন্তরিকতার সাথে সমাদর করেন। ফলে তাঁরা আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন। অবশেষে ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে এলে স্থানীয় আহমদীদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তবু বিদায় দিতে হয়। জামা'তের এক বিরাট কাফেলা বিদায় অতিথির সাথে চার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে হরিনগর লঞ্চঘাটে আসেন। তিনি লঞ্চে আরোহনের পর গন্তব্যের পথে যাত্রা করলে হাত নেড়ে নেড়ে মোবারকবাদ জানান। সতীর্থরা তীর থেকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে হাত নেড়ে ভাব বিনিময় করেন। আবার আসার আশায় বুক বেঁধে সান্ত্বনা খোঁজেন। সোনা ঝরা দিনের সেই স্মৃতি আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে সুন্দরবনের জনপদে। আহমদীদের ঘরে ঘরে।

সুন্দরবন জামা'ত সফর প্রসঙ্গে উথুলী জামা'তের আব্দুল গফুর মাষ্টার সাহেব একটি নিবন্ধন রচনা করেন। নিম্নে তা পত্রস্থ করা হলো ঃ

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর

সুন্দরবন জামা'ত ও সুন্দরবন ভ্রমণ

১৯৬৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪ ঘটিকায় বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ বিখ্যাত সুন্দরবনের পাদদেশে অবস্থিত একটি অখ্যাত ও শেষ লঞ্চ ঘাট হরিনগর-এ Pak Bay Company -এর একটি সুসজ্জিত লঞ্চ এসে পৌছে। এই লঞ্চে যে ব্যক্তির আগমনের অপেক্ষায় ঘাটে অনেক লোক অবস্থান করছিলেন তাঁরা দেখেন– লঞ্চ থেকে খুব সুন্দর এক সুপুরুষ তাঁর বোরখা পরিহিতা বিবি সাহেবাসহ তীরে নামছেন। নামার সাথে সাথে সালাম বিনিময়সহ সকলের সাথে কোলাকুলি করেন এবং উর্দুভাষায় অনেকে তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তন্মধ্যে সুন্দরবন হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শেখ জোনাব আলী, প্রেসিডেন্ট শামসুর রহমান সাহেবসহ আরও ক'জন প্রাণ খুলে কথা বলেন। পরে সবাই পদব্রজে যতীন্দ্রনগর প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেটে গন্তব্যে পৌঁছেন। তখন এই মহীয়ান অতিথির সাথে কেবলমাত্র জোনাব আলী মাষ্টার, ওয়াজেদ মল্লিক, শেখ সফর উদ্দিন ছাড়া আর কেহই সাথী হতে পারেন নি। অন্যান্য সবাই হাটায় পিছনে পড়ে যান।

প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ির দোতলা ঘরের দোতলায় তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। দোতলায় উঠার সময় তিনি পা দিয়ে ঘরের মজবুতি পরীক্ষা করেন। দুই দিন এ ঘরেই তাঁরা আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। সবার সাথে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা ও উর্দু ভাষার মিশ্রণে কথা বলার চেষ্টা বলেন। ফলে বাংলা ও উর্দুর মিশ্রণে এক অপূর্ব ভাব বিনিময় হয়।

১৯ তারিখের সকালে নাস্তা করে তিনি সুন্দরবন জঙ্গল দেখতে যান। তখন সাথে ৭/৮ জন আহমদী সদস্য ছিলেন। প্রথমে Permisson গ্রহণের জন্য বন বিভাগের রেঞ্জার অফিস বুড়ি গোয়ালিনী যাত্রা করেন। সেখান থেকে বেলা ১০টার দিকে অনুমতি গ্রহণপূর্বক জঙ্গলে প্রবেশ করেন। বুড়ি গোয়ালিনী নদী থেকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেসব নদী গেছে তার মধ্যে কলাগাচী, আর পড়শীয়া, মাদার ও চুনকুড়ী নদী দিয়ে লঞ্চে যাতায়াত করেন। যেখানে হরিন বা অন্যান্য শিকার উপযোগী জন্তু ও পাখপাখালী দেখা গেছে সেখানে নেমে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে শিকারের চেষ্টা করেছেন। সাথে সুন্দর বনের দুই একজন শিকারীও নেমেছেন। জঙ্গলে তিনি লক্ষ্য করেছেন– জীব জন্তু, পাখপাখালী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদী - নালার গতি প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রকমের গাছ পালার গুণাগুণ। লঞ্চে পূর্ব থেকে তার জন্য রক্ষিত খাবার তিনি আহার করেন এবং অন্যান্যদেরকেও বিলিয়ে দিয়েছেন। বিকাল ৪ টার দিকে বন থেকে ফিরে আসেন এবং আসরের নামাযের পর বিবি সাহেবসহ তিনি বিভিন্ন আহমদীদের বাড়ি বেড়াতে যান। সকল মানুষের জীবন যাত্রা জানতে চেষ্টা করেছেন। সর্বস্তরের মানুষের সাথেই তিনি সালাম বিনিময়ে হাসি মুখে কথা বলেন। তখন সুন্দরবনে খুবই অভাব ছিল। কিন্তু সেব্রতীদের অতিথি সেবা ছিল নজর কাড়া। এই মহান অতিথিদেরকে ঘরের মেঝে বসিয়েই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। হৃদয় উজার করে তাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনি অধিকাংশ সময় রুটি ও মাংস আহার করেন। তাছাড়া খেজুরের রসের পিঠা, খেজুরের গুড়, পাটালী গুড়, খেজুরের কাঁচা রস ও মিষ্টি ইত্যাদি পরিবেশনে তাদের আপ্যায়ন করা হয়। তিনি তৃপ্ত হয়ে আহার করেন। অনেক খাবারের প্রশংসা করেছেন।

১৯ তারিখ সন্ধ্যায় জামা'তের মসজিদে এক সভা হয়। তিনি আনন্দঘন পরিবেশে সকলের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। জামা'তের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাশেষে আবেগাপ্লুত হয়ে দীর্ঘক্ষণ জামা'তের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য দোয়া করেন। রাতেও ঘরোয়া সভা হয়।

এ মহান অতিথি মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) যখন জঙ্গলে ছিলেন তখন জামা'তের মহিলা ও গয়ের আহমদী মহিলারা তাঁর বিবি সাহেবাকে দেখতে প্রচুর ভীড় জমায়। যেহেতু তাঁর কথা বুঝতে পারছিলেন না, তাই বিভিন্ন ভাবে তাঁর সাথে ভাব বিনিময় করা হয়। কেউ কেউ তাঁর গায়ে হাত দিয়ে পরিহিত গহনা পত্র নেড়ে নেড়ে দেখেন । কিন্তু তিনি কোন বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। আর একটি বিষয় হলো– যতক্ষণ মির্যা সাহেব জঙ্গলে ছিলেন বেগম সাহেবা কোন আহার গ্রহণ করেন নি। যখন বন থেকে ফিরে আসা দেরী হচ্ছিল তখন তিনি প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ি ও পুকুর ঘাট পর্যন্ত বার বার পায়চারী করেছেন। শেষের দিকে ঘাটের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করেন এবং বন থেকে ফিরে আসার পর তিনি স্বস্তিবোধ করেন।

২০ তারিখ মসজিদে ফজরের নামাযের পর উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সকালে নাস্তা করে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ি থেকে বিবি সাহেবসহ পদব্রজে জামা'তের সদস্যদের সাথে ৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে লঞ্চ ঘাটে আসেন। সকলের সাথে কোলাকুলি করে লঞ্চে আরোহণ করেন। সকাল ১০ টায় লঞ্চ তীর থেকে ছাড়ে। সবাই হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় জানান। তাকিয়ে থাকেন জলযান লঞ্চের দিকে। তাঁর দোয়া ও পদাচরণে সুন্দরবন জামা'ত সুন্দর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। অনেক উন্নতি লাভ করে এবং এর প্রবাহমান ধারা বহমান রয়েছে। (চলবে)

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৩০/০৭/০৯ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাটাই এর উদ্যোগে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও রূহানী পরিবেশে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এস, এম, তৌফিক বেলাল, আরও উপস্থিত ছিলেন, মোহতারম আমীর সাহেব বি, বাড়ীয়া, মাওলানা নওশাদ আহমদ। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন সানাউল করীম বাবু, নযম পাঠ করেন এমদাদ উল্লাহ্ সিকদার ও জেসমিন সিকদার, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়তের পূর্ব জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব আহসান উল্লাহ্ সিকদার, হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মাওলানা নওশাদ আহমদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি সমূহের খন্ডন-সম্পর্কে জনাব মঞ্জুর হোসেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বি, বাড়িয়া। সমাপ্তি ভাষণ এস, এম, তৌফিক বেলাল, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। মেহমান এবং স্থানীয় জামা'তের সকল বয়সের প্রায় ৫২ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

আহসান উল্লাহ্ সিকদার

ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ আগষ্ট ০৯ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ১৫তম স্থানীয় ইজতেমা ঘাটুরায় জনাব মোশারফ হোসেন সহ: রিজিওনাল নায়েম সাহেব এর সভাপতিত্বে স্থানীয় ও নাটাই প্রেসিডেন্ট এবং মাওলানা নওশাদ আহমদ সাহেবের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ করা হয়। শুরুতে জনাব এস এম হাবিবুল্লাহ্ কুরআন তেলাওয়াত ও এস এম নাইম উল্লাহ্র নযম পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণ পদান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। নছিহত মূলক বক্তব্য রাখেন মাওলানা নওশাদ আহমদ। ১৪/০৮/০৯ শুক্রবার বাদ ফজর হতে বিরতিহীন ভাবে দুপুর ১.০০ পর্যন্ত বিশ্রাম ও প্রতিযোগিতা যেমন তেলাওয়াত, নযম, মৌখিক পরীক্ষা, কুইজ, পয়গামে রেসানী, দীনি মালুমাত, খেলাধূলা নেয়া হয়। বিকাল ৪ টায় সমাপ্তি অধিবেশন আরম্ভ হয়। সহ: রিজিওনাল নায়েম সাহেবের সভাপতিত্বে তিলাওয়াত নযম পাঠের পর ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। সভাপতির ভাষণের পর পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া করা হয়। এতে মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

শফিউল আলম বরকত

তরবিয়তী সভা

গত ২১/০৮/ ০৯ইং বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সরাইল-এ জনাব মীর মোহাম্মদ শফী সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে নও-মোবাঈনদের নিয়ে তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এহসানুল হাবিব জয়, নযম ছোট আতফাল আবির আহমদ। এরপর বক্তব্য পরিবেশন করেন জনাব আলহাজ্জ রফিকুল ইসলাম, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে মৌ. এনামুল হক রনি, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং নবী করীম (সা.) এর ইবাদত প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন, মাওলানা নওশাদ আহমদ। এতে নওমোবাঈনসহ ২২ জন পুরুষ ও ১২ জন লাজনা নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম

মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা-২০০৯ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমতে গত ২৬ জুন ২০০৯ইং রোজ শুক্রবার অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ জুন রাতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ২৬ জুন সকাল ১০ টায় ইজতেমা গাহের বহিরাঙ্গনে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মোহতারম এড: তাইজ উদ্দিন আহমদ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জ এবং মজলিসে আনসারুল্লাহ্র পতাকা উত্তোলন করেন সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি মোহতারম মোহাম্মদ মাহবুব আযম রেজা সাহেব কায়েদ, তবলীগ। পতাকা উত্তোলনের পর তথায় ইজতেমায়ী দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ইজতেমার মূল অনুষ্ঠান স্থলে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের প্রতিনিধি মোহতারম মোহাম্মদ মাহবুব আযম রেজা সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মোহতরম খালেদ বিন কাসেম, কায়েদ যিহানাত ও সেহ্তে জিসমানী ও জেলা নায়েম মোহতারম এ কে এম খুরশিদ আহমদ। অনুষ্ঠান এর শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতরম দরবেশ ওসমান আলী সাহেব। অত:পর ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন। নযম আবৃতি করেন মোহতরম মনির উদ্দিন আহমদ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম মঈনউদ্দিন আহমদ, যয়ীম-ই-আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ নারায়ণগঞ্জ। বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন মোহতরম শামছুল আলম, মোন্তাজিম উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের প্রতিনিধি সাহেব। অত:পর বিভিন্ন বিষয়ে

যেমন–পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অত:পর চিত্তাকর্শক খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ধির গতিতে হাটা ও ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ। উক্ত খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় আনসারগণ উৎফুল্লচিত্তে অংশগ্রহণ করেন অত:পর মধ্যাহ্ন ভোজ ও জুমুআ নামায এর বিকেল ৪টা হতে সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন আলহাজ্জ আলী আহমদ, নযম পাঠ করেন। জসিম উদ্দিন আহমদ। অত:পর তরবিয়তী বক্তৃতা পর্বে আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও ও কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন মোহতরম হাফেজ মৌ. আবুল খায়ের সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মোহতরম রফিউদ্দিন আহমদ, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। পরিশেষে সভাপতি সাহেব ভাষণ প্রদান করেন। অত:পর পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত ইজতেমা অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগ, আমন্ত্রিত অতিথি, পার্শ্ববর্তী মজলিস সমূহের আনসারসহ প্রায় ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ মেহেরবাণীতে মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ২৪-০৭-২০০৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মঈন উদ্দীন আহমদ, যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা করেন মোহতরম আহমদ আলী সাহেব। অত:পর আহাদ নামা পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের শুভ সূচনা করা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ, আহমদ আলী, শরীফ আহমদ, রফি উদ্দিন আহমদ, মোস্তফা পাটোয়ারী, এ, কে, এম খুরশীদ আহমদ, নজরুল ইসলাম সরকার এবং মনির উদ্দিন আহমদ। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মঈন উদ্দিন আহমদ

তবলীগি সভা

গত ২১/০৮/০৯ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলীতে দর্শনা, মধ্যপাড়া, শৈলমারির নও মোবাঈন ভ্রাতাদের জন্য দিনব্যাপী তবলীগ ও প্রশ্নোত্তর নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জনাব সালাহ উদ্দিন প্রেসিডেন্ট শৈলমারী জামা'ত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর বিভিন্ন দাবীর ওপরে অপবাদ খন্ডন ও দাবীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে নতুন ভ্রাতাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উম্মতি নবী ও খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

তবলীগি সভা

গত ১৪/০৮/০৯ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শৈলমারীতে জনাব সালাহ উদ্দীন প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দর্শনা, মধ্যপাড়া, শৈলমারী থেকে জেরে তবলীগ ভ্রাতাগণ উপস্থিত হয়। এতে উম্মতি নবী, খাতামান্নাবীঈন (সা.), ওফাতে ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন হাদীস থেকে বিস্তারিত আলোচনা করেন মৌ. মোজাফ্ফর আহমদ।

পুস্তক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০৮/০৯ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলী মসজিদে বাদ জুমুআ জনাব ডা. শামসুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত কিতাব 'নিশানে আসমানী' এর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুয়াযযেম আহমদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব আব্দুস সাত্তার চৌধুরী জনাব আব্দুল গফুর সাহেব। পরিশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘটে।

তবলীগি সভা

গত ০৪/০৮/০৯ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীতে নওমোবাঈনের প্রশ্নোত্তর ক্লাস ও জেরে তবলীগ মেহমান নিয়ে দিন ব্যাপি এক তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আগত বন্ধুদের পক্ষ হতে উম্মতি নবী, খাতামান্নাবীঈন (সা.), ওফাতে ঈসা (আ.), ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ মোল্লাদের বিরোধাতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন নিয়ে কুরআন হাদীস থেকে আলোচনা করা হয়।

আবুল হায়াত বিশ্বাস

তালিম তরবিয়তী সভা

১। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার নিয়মিত তরবীয়তি সভা গত ০৪/০৭/০৯ইং রোজ শনিবার বাদ মাগরিব, জনাব এস এম সেলিম ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে, জনাব শেখ নাসির মিয়া সাহেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ: আসাদউল্লাহ্ আসাদ, জনাব ফরহাদ মুন্সী ও জনাব এস, এম, ইব্রাহিম। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমপ্তি হয়। উক্ত সভায় জামা'তের ৫৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার নিয়মিত তরবিয়তী সভা গত ১১/০৭/০৯ ইং রোজ শনিবার বাদ মাগরিব জনাব এস, এম, সেলিম ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে জনাব মরহুম মৌলানা ফারুক সাহেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর বক্তৃতা প্রদান করেন, জনাব সিদ্দিক আহমদ খালেদ ও মৌ. আসাদ উল্লাহ্ আসাদ। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার

দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনা : **এম. আহমদ**

কেটে যাচ্ছে সোয়াইন ফ্লু আতঙ্ক ॥ ভিড় কমেছে হাসপাতালে

সোয়াইন ফ্লু সন্দেহে আতঙ্কগ্রস্থ সাধারণ জ্বরে আক্রান্তদের ভির কমতে শুরু করেছে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে। সাধারণ জ্বরে আক্রান্তদের খুব কম সংখ্যক লোকের মধ্যে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস পাওয়া যাচ্ছে। চিকিৎসা নিতে যাওয়া মানুষে শতকরা ১ ভাগেরও কম রোগী পাওয়া যাচ্ছে যাদের ভর্তি রাখা যাবে। রাজধানীর বাইরে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস শনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। ক্যাপসুল দেয়া যাবে এমন সোয়াইন ফ্লু রোগী এখন পর্যন্ত পায়নি দেশের অধিকাংশ সরকারী জেলা হাসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। চিকিৎসা উপকরণ ও ঔষুধপত্র নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন ওই সব চিকিৎসালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্তরা। ন্যাশনাল গাইড লাইনে তিন ক্যাটাগরিতে সোয়ইন ফ্লু রোগীর চিকিৎসা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। রাজধানীর আইসিডিডিআরবিতে চিকিৎসাধীন সোয়াইন ফ্লু আক্রান্ত এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এমনটি দাবী করেছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট। এ নিয়ে বেসরকারী হিসেবে এই রোগে মৃতের সংখ্য ৩-এ দঁড়ালো। তবে তাদের ওখানে এ পর্যন্ত কোন সোয়াইন ফ্লু রোগীর মৃত্যু ঘটেনি বলে জানিয়ে দিয়েছেন, আইসিডিডিআরবি।

(জনকণ্ঠ, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯)

সাঈদীর বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধাপরাধ মামলা ॥

যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে পিরোজপুর বিচারক হাকীমের আদালতে সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন জিয়ানগর উপজেলার টেংরাখলি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব হোসেন। মামলার অভিযোগে বলা হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাঈদী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহায়তায় পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার টেংরাখালি গ্রামে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করেন।

(ভোরের ডাক, ১ সেপ্টেম্বর ০৯)

হৃৎপিণ্ড সুরক্ষায় সবুজ শাকসব্জী ॥

সবুজ শাকসব্জী হৃৎপিণ্ডের জন্য যেমন অনেক উপকারী তেমনি এটা কিভাবে হৃৎপিণ্ডকে সুরক্ষা করে সম্প্রতি তার গবেষণা করেছেন গবেষকরা। ফুকপি, বাঁধাকপির মত সবুজ শাকসব্জী হৃৎপিণ্ডের জন্য কেন উপকারী তার সম্ভাব্য কারণ আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা। গবেষকরা তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেন, শাকসব্জীতে এক প্রকার রাসায়নিক থাকে যা ধমনীকে রোগ থেকে রক্ষা করে। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের গবেষক দল আসা প্রকাশ করেছে, তাদের এ গবেষণা চিকিৎসার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে যা হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজে লাগবে।

(খবর বিবিসি)

সংসদে ইলিশ ॥

জাতীয় সংসদে গতকাল সোমবার ইলিশ মাছ নিয়ে বেশ সরস আলোচনা হয়েছে। সবার একটাই দাবি–তারা আরো কম দামে ভালো ইলিশ খেতে চান। স্পিকার আব্দুল হামিদও সাংসদদের বক্তব্যে সায় দিয়ে মৎস ও পশুসম্পদমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'মাননীয় মন্ত্রী, সবাই ইলিশ খেতে চান। ব্যবস্থা করুন'।

(প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯)

মাদ্রাসা বোর্ড শুধু ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন করবে ॥

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড শুধু ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন করবে। এ ছাড়া বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয় মূল্যায়ন করবে সাধারণ শিক্ষা বোর্ড বা প্রস্তাবিত শিক্ষা কাউন্সিল। জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়ায় এ কথা বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম।

(প্রথম আলো, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯)

দেনার দায়ে ৮ হাজার টাকায় বউ বিক্রি ॥

চৌচির খড়ায় ফলন ভাল না হওয়ায় ঋণের দায়ে বউ বিক্রির ঘটনা ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশের বান্ডেল খণ্ড এলাকায়। মহাজনরা রীতিমত দলিল করে খেলাপি কৃষকের বউকে নিজের নামে লিখিয়ে নিচ্ছেন। বিনিময়ে কৃষক পাচ্ছেন চার থেকে বারো হাজার রূপি। এমনই এক ঘটনায় পালিয়ে আসা এক নারী জা নান, স্বামী তাকে মহাজনের কাছে ৮ হাজার টাকায় বিক্রি করে। দলিলে লিখিয়ে নিতে মহাজন তাকে আদালতে নিয়ে গেলে সেখান থেকে সে পালিয়ে আসে। ভারতের ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেনের প্রধান গিরিজা বিয়াস বলেন, এ যুগে এমন ঘটনা বিশ্বাসই করা যায় না। বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে সেখানে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছে।

(খবর ইন্ডিপেন্ডন্ট অনলাইন)